POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ
وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا
عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (المائدہ:74)

নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়'; অথচ এক মা'বুদ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে।

(আল মায়েদা: ৭৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 44-45

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 31 Oct-7 Nov 2024 2024 27 রবিউস সানি-4 জামাদিউল আওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ইসতেখারার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ
بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ
فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ
وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّیْ فِیْ دِيْنِیْ وَمَعَاشِیْ
وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ (اَوْقَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ)
فَاقْدُرْهُ لِیْ وَيَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِيْهِ وَاِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِيْنِیْ
وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ (اَوْقَالَ فِیْ عَاجِلِ
اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ) فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ
وَاقْدُرْ لِیَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ قَالَ
وَيُسَمِّیْ حَاجَتَهٗ

হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের মাধ্যমেই মঙ্গল প্রার্থনা করি, তোমার শক্তিমত্তা থেকে আমি শক্তি যাচনা করি এবং তোমার নিকটই তোমার সব চেয়ে বড় কৃপা যাচনা করি। তুমিই সর্বশক্তিমান, আমি শক্তিহীন, তুমি পরিজ্ঞাত, আমি অজ্ঞ। তুমি গোপন বিষয়াদির সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে আমার আল্লাহ! যদি তোমার জ্ঞানে এই কাজটি আমার জন্য ধর্ম, আমার জীবিকা এবং এই কাজের পরিণামের দিক থেকে উত্তম হয় (কিম্বা বলেছেন: বর্তমানে কিম্বা ভবিষ্যতের জন্য উত্তম হয়) তবে আমার ভাগ্যে তা লিখে দাও এবং এটিকে আমার জন্য সহজ করে দাও। এতে আমার জন্য বরকত দাও। আর তুমি যদি জান যে এই কাজ আমার জন্য আমার ধর্মে, জীবিকায় এবং পরিণামের দিক থেকে ক্ষতিকর (অথবা বলেছেন: বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর হয়) তবে সেটিকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও আর আমাকেও তার থেকে দূরে সরিয়ে দাও। আর যেখানে আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত আছে আমাকে সেই স্থান দান কর এবং তার উপর সন্তুষ্ট রাখ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা.) বলেছেন, এরপর (প্রার্থনাকারী) দোয়ায় যেন নিজের চাহিদার কথা উল্লেখ করে।

(বুখারী, ২য় খণ্ড কিতাবুত তাহাজ্জুদ)

সাধনা ও প্রচেষ্টা করেছে অথচ খোদাকে পায় নি এমন কে আছে? খোদাকে তো পাওয়া যায় আর অতি দ্রুত পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁকে অর্জনকারীরা কোথায়? স্মরণ রেখো! খোদার প্রতি ঈমান আনয়ন করা অনেক বড় বিষয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

সাহাবাগণের ঈমান

অতঃপর আমি সাহাবা (রা.)এর অবস্থাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে বলছি, তারা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনে নিজেদের কর্মধারার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, সেই খোদা যিনি অদৃশ্য সত্তা এবং মিথ্যার উপাসনাকারীদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন, তাঁরা সেই খোদাকে নিজেদের চোখে দেখেছেন। নচেৎ তারা কি কারণে কোন কিছুর পরোয়া করেন নি- নিজেদের জাতি, দেশ, সহায়-সম্পদ এবং বন্ধু-বান্ধবদের হেলায় ত্যাগ করেছেন? তাঁরা কেবল খোদার উপরই ভরসা করেছেন আর এক অদ্বিতীয় খোদার উপর ভরসা করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, কেউ যদি ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে দেখে তবে সে আশ্চর্য হবে। কেবল ঈমান ছিল,আর কিছুই ছিল না। অন্যথায় এর বিপরীতে ছিল বস্তুবাদিদের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র এবং প্রাণপাত প্রচেষ্টা, কিন্তু তারা সফল হতে পারে নি। তাদের সংখ্যা, দলগত শক্তি, সম্পদ সব কিছুর পরিমাণ বেশি ছিল, কিন্তু ঈমান ছিল না। আর কেবল ঈমান না থাকার কারণেই তারা ধ্বংস হয়ে হয়ে গেল, সফলতার মুখ দেখতে পেল না। কিন্তু সাহাবাগণ ঈমানী শক্তি দ্বারা সব কিছু জয় করেছেন। তাঁরা যখন এক ব্যক্তির আহ্বান শুনল, যিনি বাহ্যত নিরক্ষর হিসেবে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, কিন্তু নিজের বিশ্বস্ততা এবং সততার কারণে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি যখন বললেন, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছি, তখন সাহাবাগণ তাঁর কথা শোনামাত্রই তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান আর উন্মাদের ন্যায় তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করেন। আমি বলছি, কেবল একটি বিষয়ই তাদের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল আর সেটা ছিল ঈমান। স্মরণ রেখো! খোদার প্রতি ঈমান আনয়ন করা অনেক বড় বিষয়।

খোদা তা'লার সত্তা

ইংরেজ ও পাশ্চাত্যের জাতিগুলি জাগতিকতার অন্বেষণ এবং বাসনায় নিমজ্জিত। প্রথমে তারা একটা কাল্পনিক বিশ্বাস ও আশার উপর ভিত্তি করে কাজ শুরু করে। শত শত জীবন নষ্ট হয়, লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়, সবশেষে একটা কিছু তারা পেয়েই যায়। অতএব, কতটা পরিতাপ ও বিস্ময় তাদের জন্য যারা বলে, খোদাকে পাওয়া যায় না। সাধনা ও প্রচেষ্টা করেছে অথচ খোদাকে পায় নি এমন কে আছে? খোদাকে তো পাওয়া যায় আর অতি দ্রুত পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁকে অর্জনকারীরা কোথায়? (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২)

ঐশী জামাতের উন্নতির পথে শয়তান যতই বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করুক এবং ষড়যন্ত্র করুক, অবশেষে খোদার নবীই বিজয় লাভ করেন আর কাফেরদের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ৫৭-৫৮ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন-

যেদিন এই 'সাআত' আসবে, সেদিন পৃথিবীতে এক-দ্বিতীয় খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে আর শিরক ও কুফর পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে। যেমন দেখুন, খোদার সেই ঘর যেটা হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) এক খোদার ইবাদতের জন্য তৈরী করেছিলেন আর পরবর্তীকালে তাঁদের পথভ্রষ্ট সন্তানেরা তিনশ ষাটটি মূর্তি দিয়ে ভর্তি করে রেখেছিল, মক্কা বিজয়ের পর সেটি কিভাবে মূর্তিশূন্য হয়ে গেল আর কিভাবে এক এক করে সেগুলিকে ভেঙ্গে ফেলে বায়তুল্লাহ্‌র বাইরে নিক্ষেপ করা হল! রসুলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিটি মূর্তিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থাৎ সত্য এসে গিয়েছে আর মিথ্যা পলায়ন করেছে। আর মিথ্যা তো হয়েছে পলায়নের জন্যই। রসুলুল্লাহ্ (সা.) যখন সর্ববৃহৎ মূর্তি হোবল-কে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন এবং সেটি পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তখন এক সাহাবী (রা.) আবু সুফিয়ানের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন- আবু সুফিয়ান! তোমার মনে আছে ওহদের দিন তুমি কত গর্ব করে হোবলের জয়ধ্বনি দিয়েছিলে- 'উলু হুবুল, উল হুবুল? অর্থাৎ হুবলের সম্মান উচ্চ হোক। আজ দেখ, তোমার চোখের সামনে হুবল ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ে আছে। আবু সুফিয়ান বিরক্ত হয়ে বলল। ভাই সে সব কথা ছেড়ে দাও। যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা থাকত তবে আজ যা কিছু আমরা দেখছি তা তখনই ঘটত না। এখন তা আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, এক খোদা ছাড়া কোনও খোদা নেই। বস্তুত 'আল মুলকু ইয়াওমা ইযিল লিল্লাহি' -এর ভবিষ্যদ্বাণী সেদিন সমহিমায় পূর্ণ হয়েছিল আর আরবের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ধ্বনি আকাশে বাতাসে মুখরিত হতে শুরু করে।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, ঐশী জামাতের উন্নতির পথে শয়তান

(এরপর ৭ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, ২০১২ (মার্চ, এপ্রিল)

ওয়াকফাত নওদের ক্লাস

৭:১০টায় হুযুর আনোয়ার ওয়াকফাতে নওদের ক্লাস শুরু হয়। নাতাশা রানা কুরআন করীমের তিলাওয়াত করে এবং ফারাহ আহমদ এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করে। এরপর আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস উপস্থাপিত হয় যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করে মাদিহা দ্বীন।

হাদীস: হযরত উবাদু বিন সামিত (রা.) বর্ণনা করেন,হযরত মহম্মদ (সা.) বয়আতের সময় আমাদের কাছে এই অঙ্গীকার নেন যে, সচ্ছলতা হোক বা অভাব অনটন হোক, দুঃখ হোক বা বিষাদ-সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা মান্য করব, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করব এবং তাঁকে অনুসরণ করব, আমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও। (সহীহ মুসলিম)

এরপর আইমান ইমতিয়ায হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত উপস্থাপন করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- 'খোদার পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করা জরুরী। এটাই ইসলাম। এটাই সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। অতএব, এখন যারা এই নির্ঝরের নিকট আসে নি, যা খোদা তা'লা এই উদ্দেশ্যর জন্য সূচিত করেছেন, তারা নিশ্চয় এর থেকে বঞ্চিত থাকে।যদি কিছু অর্জন করতেহয় তবে সত্যান্বেষীর উচিত সেই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হওয়া এবং অগ্রসর হওয়া এবং প্রস্রবণের প্রবাহে নিজের মুখ রেখে দেওয়া। আর এটা ততক্ষণ হতে পারে না,যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ খোদার সামনে আত্মাভিমানের আবরণ খুলে ফেলে খোদার দরবারে লুটিয়ে পড়ে এবং এই অঙ্গীকার করে যে, যদি বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়ে, তবু খোদাকে ত্যাগ করবে না আর খোদা তা'লার পথে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। ইব্রাহিম (আ.)-এর এটাই মহান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, পুত্রের কুরবানী করার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। ইসলামের অভিপ্রায় হল আরও অনেকজন ইব্রাহিম প্রস্তুত করা। তাই তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের উচিত ইব্রাহিম হয়ে ওঠার চেষ্টা করা। আমি সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা ওলীর পূজারী হয়ো না,বরং ওলী হও। পীর পূজারী হয়ো না, বরং পীর হও।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৮-১৩৯)

বক্তৃতা

ওয়াকফাতে নওদের দায়িত্বাবলী

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ওয়াকফাতে নওদের পত্রিকা 'মরিয়ম' এর প্রবর্তনের সময় নিজের বার্তায় ওয়াকফাতে নওদের প্রতি উপদেশবাণীতে বলেছিলেন-

'ওয়াকফে নও মেয়েদের ওয়াকফ বা জীবন উৎসর্গীকরণের এই ইতিহাস কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নিজের সন্তানকে উৎসর্গকারী একজন মহিলা ছিলেন আর তিনি যাকে জন্ম দিয়েছিলেন অর্থাৎ সর্বপ্রথম ওয়াকফা নও বা উৎসর্গিত জীবন, তিনিও ছিলেন মহিলা। তাঁর নাম ছিল মরিয়ম। তাঁকে উৎসর্গকারী পিতামাতা এমন উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন এবং সেই সন্তানও নিজের মর্যাদা অনুধাবন করে ওয়াকফ বা উৎসর্গীকরণের দাবি এমনভাবে পূরণ করেছেন যে, খোদা তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীর জন্য কুরআন করীমের ন্যায় গ্রন্থে পবিত্রতা ও সতীত্বের এর দেবী এবং তাকওয়া ও পবিত্রতার সাথে জীবনযাপনকারী এই মহিলার জীবনকে পুণ্য ও তাকওয়ার উচ্চ মান অর্জনের জন্য এক মাপকাঠি হিসেবে সংরক্ষিত রেখেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০১২ সালে যুক্তরাজ্যে ওয়াকফাতে নওদের ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণে বলেন-

'আপনাদের সকলের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল সেই জীবনকেই সফল হিসেবে মনে করা হয় যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যতীত হয়। আর একজন ওয়াকফা নও মেয়ে হিসেবে আপনাদের সব সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত যে, আপনাদের সত্তা হযরত মরিয়ম (আ.)-এর সত্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ভিন্ন বাক্যে বলা যায় যে,সব সময় তাঁর চরিত্র ও কর্মধারাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে নিজেদের দৃষ্টির সামনে রাখুন। আপনাদের প্রতিটি কাজ পরিপূর্ণ সত্য এবং খোদা তা'লার ভীতির উপর করে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনারা যা কিছু করেনা বা বলেন তা থেকে যেন প্রকাশ পায় যে আপনারা ওয়াকফাতে নও। আপনারা হলেন সিদ্দীকা, যাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত। কেননা আপনারা ওয়াকফে নও। ওয়াকফাতে নওদের সদস্যা হিসেবে আপনাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, নিঃসন্দেহে আনপারা এই জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, কিন্তু জাগতিকতা ও এই সম্পর্কিত বিষয়াদির সঙ্গে আপনাদের কোন সম্পর্ক নেই।

এই বছরটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কেননা এটা এইদ বছর তাহরীক (ওয়াকফে নও) এর রজত জয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে। এই পুণ্যময় তাহরীকের ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। আপনাদের মধ্যে অনেক ওয়াকফাতে নও সর্বপ্রথম ব্যাচের অংশ আর আর প্রকৃতপক্ষে এটা অনেক সম্মানের যা আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের দান করেছে। তাই এই সকল পুরস্কাররাজির আলোকে সব সময় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা আপনাদের কর্তব্য।

মরিয়ম পত্রিকায় দেওয়া বার্তায় হুযুর আনোয়ার বলেন: "বর্তমান যুগে সেই সুন্নত অনুসারে আপনাদের মাতাপিতাও আপনাদেরকে জন্মের পূর্বে ওয়াকফ করেছেন। আপনাদের ওয়াকফ বা উৎসগীকরণের এই সম্মান ও মর্যাদা কোন সাধারণ বিষয় নয়। কিন্তু ওয়াকফের এই মর্যাদা আপনাদের মাথায় তখনই শোভা পাবে যখন আপনারা ওয়াকফের দাবি পূর্ণ করার মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে খিলাফতের অধীনে পরিচালিত করতে শুরু করবেন। এজন্য সব সময় একথা মনে রাখবেন আর পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যায়ন করলে জানতে পারবে যে, ইসলাম মহিলাদেরকে যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে তা অন্য কোন ধর্ম দেয় নি। এই কারণে একজন মহিলার জন্য প্রকৃত আনুগত্যকারী ও পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া পূর্বেও গর্বের বিষয় ছিল আর এখনও তা গর্বের।ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞান ও আমলের সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এবং ঈর্ষণীয় কাজ করেছে। আর কেবল ইসলামের প্রাথমিক যুগেই নয় বরং, দ্বিতীয় যুগে আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের যুগেও মহিলারা জ্ঞান ও আমলের ধ্বজা উড্ডীন রেখেছে।আর এখন ওয়াকফাতে নও মেয়েরাই এই ধ্বজা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমুন্নত রাখবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর হাতে সূচিত ধর্মের সংস্কারের কাজের প্রসারের প্রসার এবং ধর্মের সেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই আপনাদের দৃষ্টি সব সময় আকাশের দিকে থাকা উচিত আর আপনাদের জ্ঞান, কর্মধারা এবং বুদ্ধি আকাশের পানে ডানা মেলার সংকল্প করুক। আপনারা যদি সত্যিকার অর্থেই এই উচ্চতা অর্জন করতে চান তবে এই যুগের ইমাম এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার আলোয় যিনি পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন, সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর লেখনীসমূহ সব সময় নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখুন। যুগ খলীফার নির্দেশাবলী এবং উপদেশাবলী নিজেদের আলোকবর্তিকা বানিয়ে নিন। কেননা আজ এই শিক্ষাই জীবন সুধা যা মানুষকে শ্বাশ্বত জীবনের অধিকারী করে তোলে। এই সেই জীবনদায়ী বাণী যা মৃত হৃদয়সমূহকে চিরন্তন জীবন দান করে। এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তুলে এনে আকাশের উচ্চতায় নিয়ে যায়, যেখানে ফিরিশতারাও তাদের সঙ্গে বার্তালাপ করে গর্বিত হয়। "

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ওয়াকফে নও তাহরীকের ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন- "তোমরা এক মহৎ উদ্দেশ্যে এক গৌরবমণ্ডিত সময়ে জন্ম নিয়েছ।" এই মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আজ আমরা জামাত আহমদীয়া জার্মানীর ওয়াকফাতে নওরা এই আপনার কাছে অঙ্গীকার করছি যে, আমরা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে করা আমাদের পিতামাতার এই অঙ্গীকারকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পালন করব এবং ইসলামের পতাকাকে জ্ঞান ও আমলের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমুন্নত রাখব। হযরত আকদস মসীহ মওউদ এর ধর্ম সংস্কারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকব। খিলাফতে আহমদীয়াকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার জন্য প্রস্তুত থাকব। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীসমূহকে সব সময় নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখব এবং খলীফাতুল মসীহর প্রতিটি নির্দেশ ও উপদেশ নিজেদের জীবনের আলোকবর্তিকা বানাবো এবং আকাশের উচ্চতায় পৌঁছনোর যথাসম্ভব চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ॥

প্রিয় হুযুর! এখন আমি আপনার সামনে জার্মানী জামাতের ওয়াকফাতে নওদের সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যন তুলে ধরব।

জামাত আহমদীয়া জার্মানীতে এই মুহূর্তে ওয়াকফাতে নও-এর সংখ্যা ১৯৬৭জন। যাদের মধ্যে ৬৫২জন লাজনা এবং ৮৪১জন নাসেরাত এবং ৪৭৪জন অনুর্ধ্ব ৭।

লাজনাদের মধ্যে ৫২৬জন ওয়াকফাত নিজেদের অঙ্গীকারের নবায়ন করেছে যা প্রায় ৮০ শতাংশ।

১৬৮জন ওয়াকফাত ওসীয়ত করেছে। ১১৬জন ওয়াকফাত ইউনিভার্সিটিতে Business Administration, Islamic studies, Social Studies, Teaching, Orientalistic, Medical, Computer Science, History, Sociology,

এরপর শেষের পাতায়...

জুমআর খুতবা

(সা.) বলেন, أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعَوْنِهٖ ’অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীদের দল! আল্লাহ্ তা’লার সাহায্য ও সমর্থনের সুসংবাদে আনন্দিত হও।

এরপর বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটা সময় আসবে যখন আমি কা’বা গৃহ প্রদক্ষিণ করবো এবং এর চাবিগুলো আমার হাতে থাকবে আর কিসরা ও কায়সার (অর্থাৎ পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য) অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে আর তাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হবে।

অনেক সময় আমাদের যুবকরাও একথা শুনে প্রশ্ন করে যে, বনু কুরাইযার উপর সেই সময় কেন জুলুম করা হয়েছিল? তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, সেই কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হয়নি।

আহযাবের যুদ্ধের সময় খাবারে বরকত হওয়ার ঘটনা, পরিখা খননের সময় মুনাফিক এবং মোমেনদের অবস্থা, আঁ হযরত (সা.)-এর যুদ্ধের প্রস্তুতি, মুসলমানদের সংখ্যা, মুসলমানদের মদিনায় পৌঁছনোর পর পরিস্থিতি এবং বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার প্রভৃতি ঘটনাবলীর বর্ণনা।

আহযাবের যুদ্ধের কারণসমূহ, যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং বিবরণ

আজ থেকে খোদ্দামুল আহমদীয়া (যুক্তরাজ্যের) ইজতেমাও আরম্ভ হচ্ছে। খোদ্দামরা এ থেকে পরিপূর্ণ রূপে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন, যদিও আবহাওয়ার পূর্বাভাস হচ্ছে- হয়ত বৃষ্টি হতে থাকবে। যাহোক, আল্লাহ্ তা’লা কৃপা করুন এবং সুন্দরভাবে তাদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোক। এ দিনগুলোতে খোদ্দাম সদস্যরা আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত মান বৃদ্ধিরও চেষ্টা করুন। যে-সব দোয়া ও দরূদের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং এর তাহরীক করেছিলাম- এ দিনগুলোতে এদিকেও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন আর সর্বদা পাঠ করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা’লা সবাইকে সকল প্রকার শয়তানী আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২০ তবুক, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আহযাব বা পরিখার যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবনচরিতের বরাতে আলোচনা হচ্ছিল। গত খুতবায় আমি খাবারে বরকত সৃষ্টির অলৌকিক নিদর্শনের কথা বর্ণনা করেছিলাম। একইভাবে খেজুরে বরকত সৃষ্টির ঘটনাও পাওয়া যায়। লিখিত আছে, সামান্য খেজুর পরিখা খননকারী সবাই খেয়েছেন। এর বিশদ বর্ণনা হলো, পরিখার যুদ্ধের সময়ের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত বশীর বিন সা’দ (রা.)-র কন্যা বর্ণনা করেন, আমার মা আমরা বিনতে রওয়াহা (রা.) আমার কাপড়ে সামান্য কিছু খেজুর দিয়ে বলেন, হে কন্যা! এগুলো তোমার পিতা এবং মামাকে দিয়ে এসো। আর বলবে, এগুলো আপনাদের সকালের খাবার। তিনি বলেন, আমি এই খেজুরগুলো নিয়ে রওয়ানা হই এবং আমার পিতা ও মামাকে খুঁজতে খুঁজতে মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে মেয়ে! তোমার কাছে এগুলো কী? আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এগুলো হলো খেজুর, যা আমার মা আমার পিতা বশীর বিন সা’দ এবং আমার মামা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা-র জন্য পাঠিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, এগুলো নিয়ে আসো এবং আমাকে দিয়ে দাও। আমি সেই খেজুরগুলো মহানবী (সা.)-এর দুহাতে তুলে দেই। মহানবী (সা.) এই খেজুরগুলোকে একটি কাপড়ের ওপরে বিছিয়ে দেন এবং এরপর সেগুলোকে আরেকটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর এক ব্যক্তিকে বলেন, মানুষজনকে খাবারের জন্য ডেকে আনো। অতএব, সকল পরিখা খননকারী জড়ো হয়ে যায় আর সেই খেজুর খেতে আরম্ভ করে কিন্তু সেই খেজুরগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি যখন সবার খাওয়া শেষ হয়ে যায় তখনও খেজুর কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে নীচে পড়ছিল।”

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬২৩-৬২৪)

খাবারে বরকত সৃষ্টির আরও কিছু ঘটনা রয়েছে। উবায়দুল্লাহ্ বিন আবি বুরদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেন, উম্মে আমের আশহালিয়া (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে একটি পাত্র প্রেরণ করেন যাতে ‘হ্যায়স’ ছিল। ‘হ্যায়স’ হলো এমন খাবার যা খেজুর, ঘি এবং পনিরের মিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়। মহানবী (সা.) নিজের তাঁবুতে হযরত উম্মে সালামা (রা.)-র কাছে ছিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা থেকে খান। এরপর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সেই পাত্রটি নিয়ে বাহিরে চলে যান। আর মহানবী (সা.)-এর ঘোষক খাবারের জন্য আহ্বান করেন। তখন পরিখা খননকারীরা তা থেকে খায়, এমনকি এর দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। অথচ সেই খাবার পূর্বের মতোই (অবশিষ্ট) ছিল, যেন তা থেকে কিছুই হ্রাস পায় নি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ:৩৭০) (লুগাতুল হাদীস, ১ম খণ্ড,পৃ: ৫৪২)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) সালেক (সাধক)-এর মর্যাদার উল্লেখ করতে গিয়ে, যে অবস্থায় সে খোদার এতটা নৈকট্য অর্জন করে নেয় যে মনটি আগুন লোহার রংকে নিজের মাঝে এমনভাবে লুকিয়ে ফেলে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে অগ্নি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, আর যেটিকে ‘লিকা’র (বা খোদার সাথে সাক্ষাতের) অবস্থা বলা হয়- তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, [তিনি (আ.) সালেক-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করছেন এবং যারা ‘লিকা’র মর্যাদা লাভ করে তাদের বিষয়ে তিনি বলেন,] ‘লিকা’র এই মর্যাদায় উন্নীত মানুষের দ্বারা কখনো কখনো এমনসব কাজ সাধিত হয় যা মানবীয় সামর্থ্যের অতীত বলে মনে হয় আর নিজের মাঝে এক ঐশী শক্তির বৈশিষ্ট্য রাখে। যেভাবে আমাদের নেতা ও মনিব সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত

খাতামুল আম্বিয়া (সা.) বদরের যুদ্ধে এক মুষ্টি কঙ্কর কাফিরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন আর সেই মুষ্টি কোনো দোয়ার মাধ্যমে নয়, বরং স্বয়ং নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিতে (বলীয়ান হয়ে) নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই মুষ্টি ঐশী শক্তি প্রদর্শন করেছে আর বিরোধী সেনাদের ওপর তার এমন অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে যে, তাদের মাঝে কেউ এমন ছিল না যার চোখে এর প্রভাব পড়ে নি। তারা সবাই অন্ধের ন্যায় হয়ে যায় আর এমন আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় যে, তারা মাতালের ন্যায় পালাতে আরম্ভ করে। আর এরূপ আরও অনেক অলৌকিক নিদর্শন রয়েছে যা কেবল ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে মহানবী (সা.) দেখিয়েছেন, যেগুলোর সাথে কোনো দোয়া ছিল না। কোনো কোনো সময় সামান্য পানি যা কেবল একটি পেয়ালায় ছিল, নিজের আঙুল সেই পানিতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে তার পরিমাণ এত বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যে, পুরো সেনাবাহিনী এমনকি উট ও ঘোড়া পর্যন্ত সেই পানি পান করার পরও তার পরিমাণ ততটুকুই রয়ে যায়। আবার কখনো কখনো দুচারটি রুটিতে হাত রাখার ফলে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্তকে তা দ্বারা পরিতৃপ্ত করে দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো সামান্য দুধকে নিজের অধর দ্বারা বরকতমণ্ডিত করে এক পুরো দলের পেট তা দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো লোনা পানির (অর্থাৎ লবণাক্ত পানির কুপে) নিজের মুখের লালা মিশিয়ে সেটিকে একান্ত সুমিষ্ট করে দিয়েছেন। আর কখনো কখনো গুরুতর আহতদের বা আঘাতপ্রাপ্তদের ওপর নিজের হাত বুলিয়ে তাদেরকে সুস্থ করে দেন। কখনো কখনো যেসব চোখের অক্ষিগোলক যুদ্ধের কোনো আঘাতে বাহিরে বেরিয়ে এসেছিল, নিজের হাতের বরকতে পুনরায় ঠিক করে দেন। এমনই আরও অনেক কাজ তিনি নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে করেছেন যার সাথে একটি সুপ্ত ঐশী শক্তি মিশ্রিত ছিল।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৬৫-৬৬)

পরিখা খননের সময় মুনাফিক ও মুমিনদের অবস্থার বিবরণও রয়েছে। এর বিশদ বিবরণ হলো, ইবনে ইসহাক লিখেছেন, অনেক মুনাফিক মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন করে আর তারা সামান্য কাজ করত এবং মহানবী (সা.)-কে না জানিয়ে এবং অনুমতি না নিয়েই বাড়িতে চলে যেতো। অথচ অপরদিকে মুসলমানদের মধ্য থেকে কারও যখন কোনো প্রয়োজন দেখা দিতো তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করতেন আর যাওয়ার অনুমতি চাইতেন। এটি ছিল মুমিনদের অবস্থা। অর্থাৎ মুনাফিকরা জিজ্ঞেস না করেই চলে যেতো আর মুমিনরা জিজ্ঞেস করে যেতেন। তখন মহানবী (সা.) মুমিনদেরকে (যাওয়ার) অনুমতি প্রদান করতেন। আর তারাও নিজেদের প্রয়োজন শেষ হতেই ফিরে আসতেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭০)

মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধের প্রস্তুতির আরও বিশদ বিবরণ রয়েছে। এ বিষয়ে লেখা আছে, বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুযায়ী আবু সুফিয়ানের সেনাবাহিনীর আগমনের তিন দিন পূর্বেই পরিখা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিখা খননকারী শিশু-কিশোর ও যুবকদের সেসব দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যেখানে নারীদেরকে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল। যদিও যাদের বয়স ১৫ বছর ছিল তাদেরকে এই অনুমতি দেওয়া হয় যে, তারা চাইলে এখানে অবস্থান করতে পারে অথবা চাইলে দুর্গে ফিরে যেতে পারে। এমন যেসব যুবককে যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তাদের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত যায়েদ বিন সাবেত, হযরত আবু সাঈদ খুদরী আর হযরত বারা বিন আযেব (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭১) (গাযওয়ায়ে আহযাব, প্রণেতা, বাশামিল পৃ:১৭৫) (উইকিপিডিয়া, গাযওয়ায়ে খান্দাক)

ইবনে হিশাম-এর ভাষ্য অনুযায়ী মহানবী (সা.) মদীনায় ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। তিনি (সা.) সালাহ্ পাহাড়ের সামনে শিবির স্থাপন করেন। সালাহ্ মদীনার উত্তর দিকের একটি পাহাড় যা বর্তমানে মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়। মহানবী (সা.) এই পাহাড়টিকে নিজের পেছনদিকে রাখেন আর পরিখাকে সামনে রাখেন এবং তাঁর (সা.) সেনাবাহিনীও সেখানে ছিল। তাঁর (সা.) জন্য চামড়ার তাঁবু খাটানো হয়। মুহাজিরদের পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে আর আনসারের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭১) (উইকিপিডিয়া, সিলা পাহাড়)

মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। কারও মতে এই সংখ্যা ৯০০'র অধিক ছিল না। আবার কারও মতে এই সংখ্যা ছিল ৭০০। কারও মতে এই সংখ্যা ছিল দুহাজার এবং কারও মতে তিন হাজার ছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭১) (গাযওয়ায়ে আহযাব, প্রণেতা, বাশামিল পৃ:১৭৮) (আস সহীহ মিন সীরাতুন নবী আল আযাম, পৃ: ২৯৭, ১০ম খণ্ড) (সীরাত এনসাইক্লোপিডিয়া,পৃ:৩০০)

(মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক বিবরণ রয়েছে।) ঐতিহাসিকদের এ সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তারা যখন সংখ্যার বিষয়টি উল্লেখ করেন তখন একটি বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্যান্য বর্ণনাকে ভুল আখ্যায়িত করেন। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পরম বিচক্ষণতার সাথে কাউকে ভুল বলার পরিবর্তে এসব রেওয়ায়েতের মাঝে সমন্বয় সাধন করে বর্ণনা করেন, এগুলো পরস্পর একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। (তা) কীভাবে? তিনি (রা.) বলেন, এ সময় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে চরম মতভেদ রয়েছে। অনেক মানুষ এই সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার লিখেছেন, কেউ কেউ বারো-তেরোশ আবার অনেকে সাতশলিখেছেন। এটি এত বড়ো অসঙ্গতি যে, বাহ্যতঃ এর ব্যাখ্যা করা খু বই কঠিন বা দুরূহ মনে হয়, তাই ঐতিহাসিকগণ এর সমাধান করতে সক্ষম হন নি। কিন্তু আমি এর বাস্তবতা অনুধাবন করেছি, আর তা হলো- তিন ধরনের রেওয়ায়েতই সঠিক।

এটি বলা হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধ থেকে মুনাফিকদের প্রত্যাবর্তনের পর মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল কেবল সাতশ। এর কেবল দু বছর পর আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এ সময়ে বড়ো কোনো গোত্র ইসলাম (ধর্ম) গ্রহণ করে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করে নি। কাজেই, সাতশ মানুষের হঠাৎ করে তিন হাজারে রূপান্তরিত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয়। (এটি সম্ভব নয় যে, সাতশ মানুষ ছিল; তারা হঠাৎ করে তিন হাজার হয়ে গেছে, অথচ বাইরে থেকেও কেউ আসে নি।) অপরদিকে এ বিষয়টিও বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, ইসলামের উন্নতি সত্ত্বেও উহুদের (যুদ্ধের) দুবছর পর যুদ্ধ করতে সক্ষম মুসলমানদের সংখ্যা ততটাই থাকবে যতটা উহুদের সময় ছিল। (কিছু না কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে।) কাজেই, এই দুটি বিষয় পর্যালোচনার পর ঐ রেওয়ায়েতটিই সঠিক বলে মনে হয় যে, আহযাবের যুদ্ধের সময় যু দ্ধ করতে সমর্থ মুসলামানের সংখ্যা প্রায় বারোশ ছিল।

বাকি থাকলো এই প্রশ্ন যে, (তাহলে) কেউ তিন হাজার আবার কেউ সাতশ কেন লিখেছেন? এর উত্তর হচ্ছে, এই দুটি রেওয়ায়েত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। আহযাবের যুদ্ধের তিনটি অংশ ছিল। এর একটি অংশ ছিল তখন, যখন পর্যন্ত শত্রুরা মদীনার সামনে আসে নি কিন্তু পরিখা খনন করা হচ্ছিল। এক্ষেত্রে কমপক্ষে মাটি বহনের কাজ শিশু কিশোররাও করতে পারতো এবং কতক নারীও একাজে সাহায্য করতে পারতেন। কাজেই, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিখা খননের কাজ চলছিল, মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। কিন্তু এতে শিশুকিশোররাও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মহিলা সাহাবীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে আমরা বলতে পারি, এ সংখ্যায় কিছু নারীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হয়ত পরিখা খননের কাজ করছিলেন না, কিন্তু ওপরের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকবেন। তিনি (রা.) বলেন, এটি শুধু আমার ধারণাই নয় বরং ইতিহাস থেকেও আমার এ ধারণার সত্যায়ন হয়। যেমন লেখা আছে, যখন পরিখা খননের সময় আসে তখন সব ছেলেদেরও একত্রিত করা হয় এবং সকলপুরুষ- তা তিনি বড়ো হোন বা কিশোর, পরিখা খননে বা একাজে সাহায্য করছিলেন। অতঃপর যখন শত্রুরা এসে যায় এবং যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন মহানবী (সা.) পনেরো বছরের কম বয়সী কিশোরদের চলে যাবার নির্দেশ দেন। আর যারা পনেরো বছর বয়স্ক ছিল তাদেরকে অনুমতি দেন, চাইলে তারা থাকতেও পারে আবার চলেও যেতে পারে। এই রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, পরিখা খননের সময় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং যুদ্ধের সময় সংখ্যা কমে যায়। কেননা অপ্রাপ্তবয়স্কদের ফেরত চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অতএব, যেসব রেওয়ায়েতে তিন হাজারের উল্লেখ এসেছে- তা পরিখা খননের সময়ের সংখ্যা বর্ণনা করে, যাতে ছোটো কিশোররাও অন্তর্ভু ক্ত ছিল। আর যেমনটি আমি অন্যান্য যুদ্ধ পর্যালোচনা করে অনুমান করেছি যে, কতক নারীও ছিলেন। (কেননা অন্যান্য যুদ্ধের রেওয়ায়েতে পাওয়া যে, নারীরাও অংশগ্রহণ করতেন;) কিন্তু বারোশ সংখ্যাটি সেই সময়কার যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা (যুদ্ধক্ষেত্রে) রয়ে গিয়েছিলেন।

এখন বাকি থাকলো এই প্রশ্ন যে, তৃতীয় রেওয়ায়েত, যা সাতশ সৈন্যের উল্লেখ করে- সেটিও কি সঠিক? (তিন হাজার থেকে বারোশর কথা তো

মেনে নিলাম। এখন দেখতে হবে সাতশর রেওয়ায়েতটিও সঠিক কি-না।) এর উত্তর হলো, ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন যিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ এবং ইবনে হাযমের মতো প্রতিথযশা আলেমও দৃঢ়ভাবে তার সত্যায়ন করেছেন। তাই এ সম্পর্কেও সন্দেহ করা যায় না;(এটিও সঠিক হবে।) আর এর সত্যায়ন এভাবেও হয় যে, গভীরভাবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, যুদ্ধাবস্থায় বনু কুরায়যা যখন কাফির সেনাদলে যোগ দেয় এবং তারা মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ করার দু রভিসন্ধি করে আর তাদের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.) মদীনার ঐ দিকটির সুরক্ষা করাও আবশ্যক জ্ঞান করেন, যে-দিকে বনু কুরায়যা বসবাস করতো। এই দিকটি পূর্বে এ চিন্তা করে অরক্ষিত রাখা হয়েছিল যে, বনু কু রায়যা আমাদের মিত্র, তারা শত্রুকে এদিক দিয়ে আসতে দেবে না। অতএব, ইতিহাস থেকে জানা যায়, বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার কথা যখন জানা যায়, (যখন তাদের সম্পর্কচ্ছেদের কথা জানা যায়, তাদের প্রতারণার কথা জানা যায়,) যেহেতু বনু কুরায়যার ওপর বিশ্বাস করে (মুসলমান) নারীদেরকে সেই এলাকায় রাখা হয়েছিল যেখানে বনু কুরায়যার দুর্গ ছিল এবং তারা অনিরাপদ ছিল, (তাই) এ পর্যায়ে মহানবী (সা.) তাদের সুরক্ষা আবশ্যক জ্ঞান করেন এবং মুসলমানদের দুটি সৈন্যদল প্রস্তুত করে মহিলাদের অবস্থানের উভয় অংশে মোতায়েন করেন। মাসলামাহ্ ইবনে আসলাম (রা.)-কে দুইশ সাহাবীসহ এক জায়গায় নিযুক্ত করেন এবং যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে তিনশ সাহাবীসহ অন্য জায়গায় নিযুক্ত করেন এবং নির্দেশ দেন, অল্প কিছুক্ষণ বিরতির পর পর (তারা যেন) উচ্চৈঃস্বরে তকবীর দিতে থাকেন যেন বুঝা যায় যে,নারীরা নিরাপদ বা সুরক্ষিত আছেন। এই রেওয়ায়েতের আলোকে আমাদের এই সমস্যারও সমাধান হয়ে যায় যে, ইবনে ইসহাক পরিখার যুদ্ধে কেন সাতশ সৈন্যের কথা বলেছেন। কেননা, বারোশ সৈন্যের মধ্যে যখন পাঁচশ সৈন্যকে নারীদের সুরক্ষার জন্য পাঠানো হয় তখন বারোশ সৈন্যের মধ্যে মাত্র সাতশ অবশিষ্ট থেকে যায়, আর এভাবে পরিখার যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাসে যে তীব্র মতভেদ পাওয়া যায় তার সমাধান হয়ে যায়। ”

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০,পৃ: ৩৬৯-২৭১)

মুশরিকদের মদীনায় পৌঁছার এবং তৎপরবর্তী পরিস্থিতির বিশদ বিবরণও বর্ণিত হয়েছে যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার কু রাইশ ও অন্যান্য গোত্রের সেনাদল মদীনায় পৌঁছে এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্বে শিবির স্থাপন করে। মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কমপক্ষে বিশ দিন অথবা আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী ছয়দিন সকাল-সন্ধ্যা নিরন্ত র পরিশ্রমের মাধ্যমে এই বিশাল পরিখা (খনন) সম্পন্ন হয়। আর এই অতিশয় কঠোর পরিশ্রম সাহাবীদেরকে একেবারে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে দেয়। যাহোক, একদিকে (খননের) এই কাজ সম্পন্ন হয়আর অন্যদিকে আরবের ইহুদী ও মুশরিকরা সৈন্যসামন্তের সংখ্যা ও শক্তির নেশায় বুঁদ হয়ে মদীনার প্রান্তে উপস্থিত হয়। সর্ব প্রথম আবু সুফিয়ান উহুদ পর্বত অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেই জায়গাটিকে নির্জন ও জনমানবশূন্য দেখে মদীনার সেই দিকে অগ্রসর হয়, যেটি শহরের ওপর আক্রমণের জন্য উপযুক্ত ছিল; কিন্তু এর সামনে পরিখা খনন করা হয়েছিল। যখন কাফিরদের সৈন্যদল এখানে পৌঁছে তখন পরিখাকে তাদের পথে প্রতিবন্ধক দেখে তারা সবাই বিস্মিত ও চিন্তিত হয় এবং পরিখার ওপারে উন্মুক্ত প্রান্তরে শিবির স্থাপন করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে কাফির সৈন্যবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) তিন হাজার মুসলমানকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হন এবং পরিখার নিকটেপৌঁছে শহর ও পরিখার মাঝখানে সালাহ্ পর্বতকে নিজের পেছনদিকে রেখে শিবির স্থাপন করেন। আর পরিখাটি যেহেতু অনেক প্রশস্ত ছিল না এবং কোনো কোনো অংশ অবশ্যই এমন ছিল যে,শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ অশ্বারোহী (তার ওপর দিয়ে) লাফিয়ে শহরের দিকে আসতে পারতো; এছাড়ামদীনার সেসব দিক যেখানে (কোনো) পরিখা ছিল না বরং শুধু বাড়িঘর, বাগবাগিচা এবং শিলাখণ্ডের প্রতিবন্ধকতা ছিল, সেদিকের সুরক্ষা করাও আবশ্যক ছিল যেন শত্রু ওদিক দিয়ে বাড়িঘরের ক্ষতি করে কিংবা অন্য কোনো কৌশলে অল্প সংখ্যক মানুষ লাইন ধরে শহরে (প্রবেশ করে) আবার আক্রমণ করে না বসে- তাই মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পরিখার বিভিন্ন অংশে এবং মদীনার অন্যান্য প্রান্তের উপযুক্ত স্থানে নিরাপত্তা চৌকি বসান আর জোরালো তাগিদ দিয়ে বলেন, দিন হোক বা রাত- কোনো সময়েই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন অলস কিংবা উদাসীন না হয়। অপরদিকে কাফিররা যখন দেখে যে, পরিখার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতার কারণে উন্মুক্ত প্র ান্তরে রীতিমত যুদ্ধ করা অথবা শহরের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ করা অসম্ভ ব হয়ে পড়েছে তখন তারাও অবরোধের আদলে মদীনাকে ঘিরে ফেলে আর পরিখার দুর্বল অংশগুলো দিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ সন্ধান করতে থাকে।”

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৮৩-৫৮৪)

যাহোক, শত্রু যখন পরিখা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় তখন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। এর বিশদ বিবরণ ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা মদীনার চতুষ্পার্শ্বে অবরোধ করে ফেললেও, পূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা কোনো দিক দিয়েই পরিখা পার হতে পারে নি আর মুসলমানদের ওপর সরাসরি আক্রমণও করতে পারে নি। এমন নিরুপায় এবং অসহায় অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান আর বনু নযীরের নেতা হুয়ী বিন আখতাব প্রমুখ আরেকটি ষড়যন্ত্র আঁটে যে, মদীনার অভ্যন্তরে বসবাসরত ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যাকে যে-কোনো উপায়ে সম্মত করানো হোক, তারা যেন মুসলমানদের সাথে কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে এবং আমাদের সাথে যোগ দেয় আর তারা ভেতর থেকে যেন মদীনাবাসীদের ওপর আক্রমণ করে। অতএব, এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হুয়ী বিন আখতাব বনু কুরায়যার নেতা কা'ব বিন আসাদ কুরায়যীর কাছে আসে। কা'ব যখন তার আগমনের সংবাদ পায় তখন সে দু র্গে র (মূল) ফটক বন্ধ করে দেয়। হুয়ী ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে কা'ব ফটক খুলতে অস্বীকৃতি জানায়। হুয়ী ডাক দিয়ে বলে, হে কা'ব! তোর অনিষ্ট হোক, ফটক খুলে দে। কা'ব বলে, হে হুয়ী! তুই (একজন) দুষ্ট মানুষ। আ মি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি করেছি।আমি সেই চুক্তি ভঙ্গ করবো না আর আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বদা সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীপেয়েছি। (এক দিকে এই বিবৃতি দেয়, কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে বদলে যায়।) এরপর সে বলে, ফটক খোল, তোর সাথে আমি কিছু কথা বলবো। কা'ব বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কাজ করব না। কিন্তু কিছুটা পীড়াপীড়ির পর অবশেষে কা'ব ফটক খুলে দিলে হুয়ী বলে, হে কা'ব! তোর সর্বনাশ হোক, আমি তোর কাছে যুগের সকল সম্মান এবং (আছড়ে পড়া) উত্তাল সমুদ্র নিয়ে এসেছি। আমি তোর কাছে কুরাইশের নেতৃবৃন্দ এবং গোত্র প্রধানদের নিয়ে এসেছি। আর সে ঐসব গোত্রের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে যারা তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনার চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল আর পাশাপাশি একথাও বলে যে, আমরা পরস্পর দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেছি যে, এবার এখান থেকে মুহাম্মদ (সা.) এবং তঁ ার সঙ্গীসাথিদের সমূলে বিনাশ না করে ফিরে যাব না আর আমরা এতে সফলও হতাম যদি আমাদের পথে এই পরিখা বাধ না সাধতো। কিন্তু এসব কথা শুনেও বনু কুরায়যার নেতা কা'ব চুক্তি ভঙ্গ করতে সম্মত হয় নি। বরং সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! তুই আমার কাছে এ যুগেরলাঞ্ছনা ও এমন মেঘ নিয়ে এসেছিস যার মাঝে কোনো পানি নেই। এটি কেবল গর্জন ও বিদ্যুৎ চমক দেখায়, এর মাঝে কিছুই নেই।

হে হুয়ী! তুই ধ্বংস হ, আমাকে আমার মতো থাকতে দে, কেননা আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বদা সত্যভাষী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী পেয়েছি। {বার বার এ কথাই বলছিল যে, মহানবী (সা.) সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী।} তিনি আমাদের ওপর কোনোরূপ বল প্রয়োগ করেন না আর আমাদের ধর্মের বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপও করেন না। তিনি আমাদের উত্তম প্রতিবেশী। অতএব, তুই ফেরত চলে যা। পাছে আমাদের পরিণতিও আবার তদ্রুপ হয়, যেমনটি আমাদের পূর্বে তোদের হয়েছে।

কিন্তু হুয়ী কা'বকে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করতে থাকে, এমনকি সে নিজের গোত্র এবং বনু কায়নুকার দুঃখকষ্ট এবং বিপদাবলির উল্লেখ করে। (ভাবটা এমন) যেন এই মুসলমানদের কারণেই আমাদের এসব দুঃখকষ্ট হচ্ছে। এমনকি অবশেষে সে কা'বের হৃদয় নরম করতে সফল হয় আর কা'বও পরিশেষে তার প্রতারণরা ফাঁদে পা দেয়, তার প্রকৃতিতে নিহিত প্রতিজ্ঞাভঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায় এবং হুয়ীকে সে বলে, ঠিক আছে, ধরো আমি যদি তোমার কথা মেনে নিলাম; কিন্তু কুরাইশ এবং গাতাফান যদি ফেরত চলে যায় এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমাদের কী হবে? তখন হুয়ী বলে, তুমি চিন্তিত হয়ো না, এমন পরিস্থিতিতে আমি তোমার সাথে তোমার দুর্গে প্রবেশ করবো এবং যে বিপদ তোমার ওপর আসবে সেটা আমার ওপরও আসবে।

এসব কথাবার্তা বা যুক্তি-পরামর্শের পর অবশেষে কা'ব বিন আসাদ মহানবী (সা.)-এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে। এ সময়ে কা'বের সঙ্গী আমর বিন সওদা তাকে হিতোপদেশ দেয় এবং তাকে এই অপকর্মের (পরিণাম) সম্পর্কে সতর্ক করে। আর তাকে মহানবী (সা.)-এর সুদৃঢ় চুক্তির কথা স্মরণ করায় এবং তাকে বলে, যদি তুমি মুহাম্মদ (সা.)-কে সাহায্য না করো তাহলে তাঁকে এবং তাঁর শত্রুদের ছেড়ে দাও, কিন্তু প্রতিশ্রুতি

ভঙ্গ করে বিরোধী আক্রমণকারীদের সঙ্গ দিও না। কিন্তু সে (মানতে) অস্বীকার করে।

এই অবস্থা দেখে বনু কুরায়যার কতিপয় পুণ্যবান ইহুদী ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে চলে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বনু কুরায়যার চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পান, তিনি মহানবী (সা.)-কে তা অবহিত করেন, তখন তিনি (সা.) সা'দ বিন মুআয ও সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। এই দুজন তাদের জাতির নেতা ছিলেন এবং এই দুজনের সাথে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.) এবং খওয়াত বিন জুবায়ের (রা.)-কেও প্রেরণ করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)-কেও সাথে পাঠান আর বলেন, তোমরা যাও এবং গিয়ে দেখো, এই জাতি সম্পর্কে আমরা যে সংবাদ পেয়েছি তা সত্য কি-না? যদি এই সংবাদ সত্য হয় তাহলে সবার সামনে একথা বলবে না বরং ইঙ্গিতে আমাকে বলবে, যেন আমি জানতে পারি এই সংবাদ সত্য। আর যদি তারা এই চুক্তিতে বহাল থাকে এবং এই সংবাদ মিথ্যা হয় তাহলে এই কথা প্রকাশ্যে সবার সামনে বলে দিও। অতএব, এই প্র তিনিধি দল বনু কুরায়যার নিকট যায়। সেখানে যখন কা'ব এবং তার সঙ্গীদের সাথে কথা হয়, তখন তাদের আচার-ব্যবহারই বদলে গিয়েছিল। যখন কা'বকে বলা হয় যে, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ; তখন সে চরম অবজ্ঞাভরে বলে, কোন রসূল? আমাদের কোনো চুক্তি নেই। আমি এই চুক্তিকে এভাবে ছিঁড়ে ফেলেছি যেভাবে জুতার ফিতা ছিঁ ড়ে ফেলা হয়। বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই সময়ে উভয়পক্ষের মাঝে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হয়। যাহোক, এই প্রতিনিধি দল ফিরে আসে এবং তারা ইশারা-ইঙ্গিতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে (আসল ঘটনা) বর্ণনা করেন। এমন স্নায়ু -বিধ্বংসী ও চৈতন্য লোপ পাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। (তাঁর ওপর কোনো প্রভাব পড়ে নি। সাধারণ মানুষের তো চৈতন্য লোপ পেত।) তিনি (সা.) বলেন, أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِ اللهِ تَعَالَى وَعَوْنِهِ- 'অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীদের দল! আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের সুসংবাদে আনন্দিত হও।

এরপর বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটা সময় আসবে যখন আমি কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করবো এবং এর চাবিগুলো আমার হাতে থাকবে আর কিসরা ও কায়সার (অর্থাৎ পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য) অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে আর তাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হবে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৩-৩৭৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন, আবু সুফিয়ান এই কৌশল অবলম্বন করে যে, বনু নযীরের ইহুদী নেতা হুয়ীবিন আখতাবকে এই নির্দেশ দেয়, সে যেন রাতের আঁধারে বনু কুরায়যার দুর্গ অভিমুখে যায় এবং তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বনু কুরায়যাকে নিজের দলে নেওয়ার চেষ্টা করে। তদনুযায়ী হুয়ী বিন আখতাব সুযোগ বুঝে কা'বের বাড়িতে যায়। প্রথমে তো কা'ব তার কথা শুনতেই চাচ্ছিল না এবং বলে যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে আমাদের শান্তি চুক্তি রয়েছে আর মুহাম্মদ (সা.) সর্বদা নিজের অঙ্গীকার ও সন্ধিচুক্তি বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করেছেন বিধায় আমি তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। কিন্তু হুয়ী তাকে এমন প্রলোভন দেখায় এবং ইসলামের আসন্ন ধ্বংসের বিষয়ে আশ্বস্ত করে আর নিজের এই অঙ্গীকার অর্থাৎ, আমরা ইসলামকে নির্মূল না করা পর্যন্ত মদীনা থেকে ফিরে যাবো না- এত দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করে যার ফলে অবশেষে সে সম্মত হয়ে যায়। আর এভাবে বনু কুরায়যার শক্তির পাল্লা সেই পাল্লার সাথে মিলে যায় যা প্রথম থেকেই অনেক ভারী ছিল। (অর্থাৎ, সেই কাফিরদের সংখ্যা তো প্রথম থেকেই অনেক বেশি ছিল এবং ইহুদীদের চুক্তিভঙ্গের কারণে সেইসাথে তাদের শক্তি আরও বেড়ে যায়।) এমনিতে তো মহানবী (সা.) প্রথমে দু -তিন বার গোপনে যুবায়ের বিন আওয়ামকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তুযখন বনু কুরায়যার এই ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতার কথা তিনি (সা.) জানতে পারেন তখন রীতিমতো অওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রধান সা'দ বিন মু আয এবং সা'দ বিন উবাদা (রা.)সহ আরও কয়েকজন প্রভাবশালী সাহাবীকে বনু কুরায়যার কাছে একটি প্রতিনিধি দল হিসাবে প্রেরণ করেন। আর তাদেরকে জোরালোভাবে নির্দেশ দেন, কোনো উদ্বেগজনক সংবাদ পেলে ফিরে এসে যেন তা প্রকাশ্যে বর্ণনা না করে, বরং আকার-ইঙ্গিতে তা বুঝায়, যেন মানুষের মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি না হয়। এই প্রতিনিধি দল যখন বনু কুরায়যার বাড়িতে পৌঁছায় এবং তাদের গোত্রপ্রধান কা'ব বিন আসাদের নিকট যায় তখন সেই হতভাগা তাদের সাথে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে সাক্ষাৎ করে। আর উভয় সা'দের পক্ষ থেকে চুক্তির কথা উল্লেখ করা হলে সে এবং তার গোত্রের লোকেরা বিরক্তির সুরে বলে, যাও! মুহাম্মদ (সা.) এবং আমাদের মাঝে কোনো চুক্তি নেই। এই বাক্য শুনে সেই প্রতিনিধি দল সেখান থেকে উঠে চলে আসে। আর সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞার সাথে তাঁকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ:৫৮৪-৫৮৫)

অনেক মানুষ, এমনকি আমাদের (জামা'তের) যুবকরাও অন্যদের কাছ থেকে শুনে এই প্রশ্ন করে বসে যে, বনু কুরায়যার প্রতি সে সময় কেন নির্যাতন চালানো হয়েছিল? তারা চুক্তিভঙ্গ করেছিল বিধায় তাদেরকে এর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। মহানবী (সা.) -এর পক্ষ থেকে তাদের ওপর কোনো নির্যাতন চালানো হয় নি। যাহোক, এ সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ রয়েছে এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর উল্লেখ আগামীতে করব, ইনশাআল্লাহ্।

আজ থেকে খোদ্দামুল আহমদীয়া (যুক্তরাজ্যের) ইজতেমাও আরম্ভ হচ্ছে। খোদ্দামরা এ থেকে পরিপূর্ণ রূপে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন, যদিও আবহাওয়ার পূর্বাভাস হচ্ছে- হয়ত বৃষ্টি হতে থাকবে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন এবং সুন্দরভাবে তাদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোক। এ দিনগুলোতে খোদ্দাম সদস্যরা আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত মান বৃদ্ধিরও চেষ্টা করুন। যে-সব দোয়া ও দরূদের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং এর তাহরীক করেছিলাম- এ দিনগুলোতে এদিকেও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন আর সর্বদা পাঠ করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সকল প্রকার শয়তানী আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখুন।

আজ আমি (কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির) গায়েবানা জানাযাও পড়াবো; তাদের স্মৃতিচারণ করছি। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো, রাবওয়া নিবাসী মোহতরম হাবীবুর রহমান যিরভী সাহেবের যিনি সম্প্রতি ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন এবং ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল সূফী খোদা বখশ যিরভী। তাদের বংশে তার পিতা সূফী খোদা বখশ যিরভী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয়, যিনি ১৯২৮ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হাবীবুর রহমান যিরভী সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাইব্রেরি সায়েন্সে এমএসসি করেন। ১৯৮১ সালে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন এবং তার ওয়াক্ফ গৃহীত হয়। এরপর ১৯৮১ সালে সহকারী লাইব্রেরিয়ান হিসেবে তার পদায়ন হয়। তারপর তিন-চার বছর খিলাফত লাইব্রেরির ইনচার্জ হিসেবেও সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। এরপর নাযারাত ইশায়াতে তার পদায়ন হয়, অতঃপর তাহের ফাউন্ডেশনে নিযুক্ত হন আর বর্তমানে তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব নাযের দিওয়ান হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। খোদ্দামুল আহমদীয়াতেও তিনি মু হতামিম হিসেবে বিভিন্ন বিভাগে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। মজলিস আনসারুল্লাহ্তেও তিনি কেন্দ্রীয় কায়েদ হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখিত বিভিন্ন পুস্তকাদি থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত একত্রিত করে একটি পুস্তক আকারে সংকলন করেছেন যা 'তাযকারে মাহদী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অসংখ্য পাণ্ডুলিপির কাজ করছিলেন যার মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক পুত্র ও দুই কন্যা দান করেছেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। খুবই শান্ত স্বভাবের এবং নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তার প্রতি যে দায়িত্বই অর্পণ করা হতো তা সুচারুরূপে পালন করতেন। সর্বদা ওয়াক্ফের দাবি পূর্ণ করেছেন এবং পাগলপারা হয়ে কাজ করেছেন। খুবই মিশুক ও প্রফুল্লচিত্তের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন,তার সন্তানদেরও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ ডাক্তার সৈয়্যদ রিয়াযুল হাসান সাহেবের; তিনিও সম্প্রতি ইন্তে কাল করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি ব্রিগেডিয়ার ডাক্তার যিয়াউল হাসান সাহেবের পুত্র ছিলেন। এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন এবং ডাক্তার হিসেবে সেবা করতে থাকেন। শৈশব থেকেই জামা'তের সেবা করে আসছেন। মজলিস নুসরত জাহাঁ-র অধীনে প্রায় বিশ বছরের অধিক সময় ধরে উগান্ডা, কেনিয়া, গাম্বিয়া এবং পাকিস্তানে অনেক সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। কেনিয়ায় কয়েক বছর সেবা প্রদানের পর তিনি কেনিয়া থেকে স্পেশালাইজেশন এবং জেনারেল সার্জন প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তানে আসার অনুমতি চেয়েছিলেন।

সেখান থেকে চলে যান এবং বিভিন্ন মেডিকেল ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট অর্জন করেন। তিনি মেডিকেল বিশ্ব বিদ্যালয়ে ডাক্তারদের এ্যানাটমি পড়ানোরও সৌভাগ্য লাভ করেন। খুবই অভিজ্ঞ ডাক্তার ছিলেন। গাম্বিয়ায় স্থানীয় ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য করতেন। তাদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করতেন, চাকরি খুঁজতে তাদেরকে সাহায্য করতেন। দরিদ্র ও অভাবীদের আর্থি ক সাহায্য করতে সদা প্র স্তুত থাকতেন। তার এটিও একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি অনেক দোয়া করতেন এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। যুবক বয়স থেকেই তার তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ছিল। তার পরিচিতরা লিখেছেন, অত্যন্ত মিশুক, রোগীদের প্রতি সত্যিকার স্নেহ, সহানুভূতি এবং ভালোবাসা রাখতেন। পরিশ্রমী, উদ্যমী, খোদার ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল মানুষ ছিলেন। দোয়ার প্রতি মনোযোগী এবং মানবহিতৈষী সত্তা ছিলেন। তার ব্যা ক্তিত্বে নম্রতা, বিনয় এবং সেবার অফুরন্ত স্পৃহা ছিল। অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অনেক সম্মান করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ রাবওয়া নিবাসী মুকাররম অধ্যাপক আব্দুল জলীল সাদেক সাহেবের; তিনি সম্প্রতি ৮০ বছর বয়সে ইন্তে কাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন । তিনিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি রাবওয়ার কুরাইশী আব্দুল গনী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তার বংশে তার দাদা গুজরাট জেলার গোলেকী নিবাসী হযরত মিয়াঁ কুতুব উদ্দীন সাহেব এবং নানা ডেরা গাজী খান জামা'তের আমীর মৌলভী মুহাম্মদ উসমান সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। জলীল সাদেক সাহেব রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ বা স্নাতকোত্তর করেন। এরপর ১৯৬৪ সালে তা'লীমুল ইসলাম কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সালে পুনরায় তিনি ইংরেজিতে এমএ করেন। এরপর রীতিমতো তা'লীমুল ইসলাম কলেজের ইংরেজি বিভাগে পদায়ন হয়। টানা ৩৯ বছর পর্য ন্ত পড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।(হুযূর বলেন,) আমি নিজেও কলেজে তার ছাত্র ছিলাম। খুবই শান্ত স্বভাবের এবং স্নেহের সাথে পাঠদানকারী শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক রাখতেন এবং ছাত্রদের সম্মান করতেন। অবসরের পর তিনি ২০০৩ সালে জীবন উৎসর্গ করেন এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তরতীব ও রেকর্ড বিভাগের ইনচার্জ হিসেবে তার পদায়ন হয়, যেখানে তিনি নায়েব নাযের ছিলেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার মু হতামিম হিসেবে বিভিন্ন স্থানে তার সেবা করার সুযোগ হয়। তিনি পাকিস্তানের মজলিসে সেহত-এর সভাপতিও ছিলেন। এরপর ১৯৮৩ সাল থেকে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কাযা বোর্ডের কাযীও ছিলেন। নিজের হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালনের তৌফিক লাভ করেন। তার দুই কন্যা এবং এক পুত্র রয়েছে। তার সম্পর্কে স্মৃতিচারণকারীদের একজন যথার্থই লিখেছেন যে, তিনি অত্যন্ত পরিশীলিত প্র কৃতির দরবেশ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতে পছন্দ করতেন। কিন্তু যখন কথা বলতেন- সর্বদা বুঝেশুনে, হিসেব করে এবং যাচাই-বাছাই করে কথা বলতেন। পবিত্র ও সহনশীল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনধিকার চর্চা করতেন না। যেখানে প্রয়োজন হতো অবশ্যই উত্তম পরামর্শ প্রদান করতেন। পুণ্যকাজে উৎসাহ প্রদান করতেন। কখনো কারও দ্বারা কষ্ট পেলে অভিযোগ করতেন না। পরম ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ এবং স্বল্পেতুষ্ট ব্যক্তিত্বে র অধিকারী ছিলেন। অসহায়-অভাবীদেরকে নীরবে এবং গোপনে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল, তিনি নিয়মিত পত্র লিখতেন। তার পারিবারিক জীবনও অত্যন্ত সুমধুর ছিল; বাড়িতেও এবং স্ত্রীর সাথেও। এছাড়া পিতামাতার সেবক এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী ছিলেন; বরং তার ভাই লিখেছেন, ভাইবোনদেরও অনেক খেয়াল রাখতেন এবং একান্ত আবশ্যিক দায়িত্ব জ্ঞান করে তাদের সেবা করতেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ ঝং নিবাসী মুকাররম মাস্টার মুনীর আহমদ সাহেবের। তিনিও সম্প্রতি ৮২ বছর বয়সে ইন্তে কাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তার পিতা মিয়াঁ গোলাম মুহাম্মদ সাহেব ১৯৩০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়আত করেছিলেন। মাস্টার সাহেব জন্মগত আহমদী ছিলেন। খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্তে তিনি চল্লিশ বছর সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ঝ ং-এর জেলা কায়েদ এবং জেলা নাযেম ছিলেন। পরবর্তীতে চিনিউট জেলা হবার পর সেখানকারও (নাযেম) ছিলেন। জামা'তের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ সেবক ছিলেন এবং মানবহিতৈষী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে ঝংএ চাকরি করেছেন আর তার হাজার হাজার ছাত্র আছে, যারা তাকে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন।

তিনি মানুষের অনেক উপকারে আসতেন। সরকারি দপ্তরে যাবার ক্ষেত্রে তিনি মানুষের, বিশেষভাবে আহমদীদের অনেক উপকার করতেন আর তাদের কাজে কেবল সহযোগিতাই করতেন না, বরং নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদের আতিথেয়তাও করতেন। তার সম্পর্কের পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিল এবং সেসব সম্পর্ককে জামা'ত এবং জামা'তের সদস্যদের সেবায় ব্যবহার করতেন। এমন নয় যে,ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতেন। আহমদী কারাবন্দি হোক বা অ-আহমদী- তাদের কল্যাণে ও সেবায় সদা সচেষ্ট থাকতেন। জেলখানার কর্মকর্তাদের সাথে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল যার মাধ্যমে তিনি জামা'তের কারাবন্দিদের কল্যাণ প্রদানে সচেষ্ট থাকতেন। জেলখানায় সুযোগসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে তার ব্যাপক যোগাযোগ ছিল। (হুযূর বলেন,) যখন আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার সাথিরা জেলে ছিলাম, সে সময়ও তিনি আমাদের অনেক সেবা করেছেন আর সে সময় জেলারের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকার কারণে আমাদের জন্য অনেক সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন- যা সাধারণ বন্দিদের সরবরাহ করা হয় না। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এমন নয় যে, তিনি কেবল বিশেষ ব্যক্তির সেবা করতেন, বরং তিনি ধনী-দরিদ্র প্রত্যেক আহমদীর সেবার জন্য সর্ব দা প্রস্তুত থাকতেন এবং সাধারভাবেও বন্দিদের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করতেন। কাদিয়ানের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। প্রায় প্রতি বছর তিনি কাদিয়ান যেতেন এবং সেখানে ডিউটিতেও যোগদান করতেন। আর তার জেলার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা যখন তার জেলা পরিদর্শনে যেতেন তখনও তাদেরকে ষোলোআনা সহযোগিতা করতেন। ১৯৮৮ সালে তার বিরুদ্ধে লিফলেট বিতরণের কারণে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু যাইহোক, পরবর্তীতে তা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার কোনো সন্তানাদি ছিল না।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল,১১ অক্টোবর, ২০২৪)

****

(এরপর শেষের পাতায়.....)

যতই বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করুক এবং ষড়যন্ত্র করুক, অবশেষে খোদার নবীই বিজয় লাভ করেন আর কাফেরদের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তাই মোমেনরা উন্নতি করে চলে, কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা বিফল মনোরথ হয়ে ক্ষোভ ও ব্যর্থতার আগুনে পুড়তে থাকে আর এই ইহকালই তাদের জন্য দোযখ হয়ে ওঠে।

'আল মুলকু ইয়াওমু ইযিন লিল্লাহি' বাক্যাংশে প্রসঙ্গত আরও একটি আপত্তির উত্তর পাওয়া যায়। অনেকে সূরা ফাতিহার 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' -এর উপর আপত্তি করে বলে, আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে একথা কেন বলা হয় যে, তিনি 'মা-লিক', 'মালিক' কেন বলা হয় নি। কেননা, 'মালিক' বা বাদশাহর ক্ষমতা 'মা-লিক' এর চায়তে বেশি হয়ে থাকে। এর উত্তর 'আল মুলকু ইয়াওমু ইযিন লিল্লাহি' -তে দেওয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন- সেই দিন রাজত্ব আল্লাহরই হবে আর তিনি তাদের মাঝে বিচার করবেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি জাগতিক কোন বাদশাহর মত কোন আইনের অধীন। কেননা তিনি নিজেই বলেন, একটা উন্নত আইন তার জন্য মেনে চলা হয় যার বিচারে অন্যায়ের হস্তক্ষেপ থাকে। কিন্তু খোদা তা'লা দয়াবান, তাঁর বিচারে কোন অন্যায় থাকে না। বরং তিনি সকলের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করেন।

(তফসীর কবীর,৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ: ৭৭)

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৪ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

জুমআর খুতবা

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِم

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! ঐশীগ্র ন্থ অবতীর্ণকারী! দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! তুমি সৈন্যদলকে পরাস্ত করো। হে আল্লাহ্! তাদেরকে পরাভূত করো এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

"একদিন আক্রমণ এত কঠিন হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের কতিপয় নামায সময়মতো আদায় করা সম্ভব হয়নি। যাতে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এতটা কষ্ট পান যে, তিনি বলেন, খোদা তা'লা কাফেরদের শাস্তি দিন, তারা আমাদের নামায নষ্ট করেছে। ..... এতে মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্রের একটি দিক বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। আর জানা যায় যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস তাঁর জন্য ছিল খোদার ইবাদত করা।

"এই বিপদের দিনগুলোতেও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই যথাসময়ে আদায় করতেন। আর যদি একদিন শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের কারণে তিনি তাঁর প্রভুর নাম নিশ্চিন্তে ও স্বাচ্ছন্দ্যে যথাসময়ে না নিতে পারেন তাহলে তিনি প্রচণ্ড কষ্ট পান।"

হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি যখন যাত্রা করি তখন আমি দেখি যে, আমার শরীরে ঠান্ডার কোন নাম-চিহ্ন নেই। কোথায় এই অবস্থা ছিলো যে, ঠান্ডায় আমি কাঁপছিলাম, তিনি বলেন, ঠান্ডার কোন নাম-চিহ্নও ছিলো না বরং আমার এমন মনে হচ্ছিল যে, একটি উষ্ণ রুমের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এবং আমার ভয় দূর হতে লাগলো।

কাফেরদের পলায়নের সংবাদে মহানবী (সা.) বলেন: "এটি আমাদের কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা বাহুবলের পরিণাম নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ফলেই (এই বিজয়) লাভ হয়েছে যিনি নিজ ফুৎকারে এই শত্রুদলকে পরাস্ত করেছেন।"

যেভাবে আপনারা জানেন পৃথিবীর অবস্থা প্র তিনিয়ত অবনতির দিকে যাচ্ছে, ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। আমেরিকা এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। যুদ্ধ বিস্তৃত হয়ে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের এবং নিরপরাধদের এর ভয়ানক কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করুন। এর জন্য আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কে অগ্রসর হতে হবে এবং দোয়ার দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। এর দিকে প্রত্যেক আহমদীকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

পাকিস্তানের আহমদীদের অবস্থার অনেক বেশি অবনতি হচ্ছে, তাদের জন্য দোয়া করুন। বাংলাদেশের আহমদীদের অবস্থার উন্ন তির জন্যও দোয়া করুন। তাদের ওপরও অনেক কঠোরতা করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি দয়া ও কৃপা করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত ৪ অক্টোবর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (৪ ইখা, ১৪০৩ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজকাল খুতবাতে আহযাবের যুদ্ধের বর্ণনা চলছে। আহযাবের যুদ্ধের আরও বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা যখন পরিখা অতিক্রম করা সত্ত্বেও কোনো সফলতা লাভ করতে পারেনি, বরং একান্ত পরাজয় বরণ করতে হয়, তখন তারা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা সবাই প্রভাতে আক্রমণ করবে আর কেউ পেছনে থাকবে না। সারারাত তারা প্রস্তুতি নিতে থাকে। আর সূর্যে াদয়ের পূর্বে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সামনে পরিখার প্রান্তে চলে আসে। মুশরিকরা সকল দিক থেকে পরিখা ঘেরাও করে। আর একটি বাহিনীকে মহানবী (সা.)-এর তাঁবুর প্রতি মনোযোগী করে। তাতে খালেদ বিন ওয়ালীদ ছিলেন। বার বার পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টার পাশাপাশি প্রচণ্ড তিরন্দাজির মোকাবিলা হয়। কাফেররা মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে কোনো উদাসীনতার অপেক্ষায় থাকে যে, কোথাও সুযোগ পেলেই তারা পরিখা অতিক্রম করবে। আর এসব আক্রমণ ও চেষ্টাপ্রচেষ্টা নিয়মিত বিরতিতে চলতে থাকে। সেই সময়ই ওয়াহশী বিন হারব তোফায়েল বিন নোমানকে, আর কারো কারো মতে তোফায়েল বিন মালেক বিননোমান আনসারীকে নিজের ছোটো বর্শার আঘাতে শহীদ করে দেয়। হযরত সা'দ বিন মুআযের শরীরেও একটি তির লাগে যার ফলে তিনি আহত হন। আর এই আঘাতের কারণেই কিছুদিন পর তার শাহাদাত হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮০) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৫)

আর এটিই সেই দিন ছিল যেদিন মুসলমানদের জন্য নামায পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় আদায় করা কঠিন হয়ে যায়। সেদিনের নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততা আর বার বারের আক্রমণের কারণে, যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে, পরের বর্ণনাকারীরা এই কথাগুলোকে সঠিকভাবে সুরক্ষিত রাখতে পারেনি। আর কিছুকাল পর মূলবিষয় এটি হয়ে উঠে যে, সেদিন মহানবী (সা.) সহ মুসলমানরা যোহরের নামাযও আদায় করতে পারেনি আর আসরের নামাযও আদায় করতে পারেনি। এমনকি সূর্যাস্ত হয়ে যায়। সাধারণত এটি একটি গল্প হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আর এই নামাযগুলো সূর্যাস্তের পর আদায় করা হয়। কতিপয় ঐতিহাসিক তো এটি পর্যন্ত বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা অস্ত যাওয়া সূর্যকে ফিরিয়ে দেন যেন মুসলমানরা যোহর ও আসরের নামায আদায় করতে পারে। অথচ বাস্তবে তা হয়নি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেই দিনটি অত্যন্ত কঠোর দিন ছিল। মহানবী (সা.) সহ সমস্ত মুসলমান নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিলেন। কিন্তু এমনও নয় যে, এরা সবাই, আর বিশেষত মহানবী (সা.) কোনো নামাযই পড়তে পারেননি। কঠোর দিন যদিও ছিল, কিন্তু এটি নয় যে, মোটেই নামায পড়তে পারেননি। সেদিনও নামায যদিও আদায় করেছেন কিন্তু এক চলমান ভীতি ও বিপদের অবস্থায় এই নামাযগুলো আদায় করা হয়েছে। আর সম্ভবত আসরের সময় আক্রমণ সমূহ এত জোরালো হয় যে, আসরের নামায আদায় করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে থাকবে আর তা ক্রান্তিকালে পড়া হয়ে থাকবে।

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "একথা সঠিক নয় যে, এদিন মুসলমানদের সব নামায সময়মতো আদায় করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ, এই যে বলা হয়, নামায পড়া সম্ভব হয়নি- একথা সঠিক নয়। বরং যেমনটি সহীহ রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিষয় কেবল এটি হয়েছিল যে, তখন পর্যন্ত যেহেতু ভীতিপূর্ণ সময়ের নামাযের বিধান অবতীর্ণ হয়নি তাই চলমান বিপদ ও ব্যস্ততার কারণে শুধু একটি নামায অর্থাৎ আসর-এর সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল, যা মাগরিবের সাথে মিলিয়ে পড়া হয়েছিল। আর কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী কেবল যোহর ও আসরের নামায অসময়ে আদায় করা হয়েছিল।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৮৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটিকে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "একদিন আক্রমণ এত কঠিন হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের কতিপয় নামায সময়মতো আদায় করা সম্ভব হয়নি। যাতে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এতটা কষ্ট পান যে, তিনি বলেন, খোদা তা'লা কাফেরদের শাস্তি দিন, তারা আমাদের নামায নষ্ট করেছে। এতে মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্রের একটি দিক বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। আর জানা যায় যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস তাঁর জন্য ছিল খোদার ইবাদত করা। যখন শত্রুরা চতু র্দিক থেকে মদিনা ঘিরে রেখেছিল। যখন মদিনার পুরুষরা দূরে থাক, সেসব নারী ও শিশুদের প্রাণও বিপদের মাঝে ছিল। যখন প্রতিটি ক্ষণে মদিনাবাসীদের হৃদয় কেঁপে উঠছিল যে, শত্রুরা কোনো দিক দিয়ে মদিনার ভেতরে প্রবেশ না করে যায়। তখনও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাসনা এটিই ছিল যে, খোদা তা'লার ইবাদত যেন নির্দিষ্ট সময়ে উত্তমভাবে আদায় করা যায়। অর্থাৎ, চরম ভীতিপূর্ণ অবস্থায়ও তাঁর চাওয়া কেবল এটিই ছিল যে, ইবাদত কোথাও নষ্ট না হয়ে যায়। মুসলমানদের ইবাদত ইহুদি ও খ্রিষ্টান এবং হিন্দুদের ন্যায় সপ্তাহে কেবল কোনো একদিন হয় না, বরং মুসলমানদের ইবাদত দিনে ও রাতে পঁ াচবার হয়ে থাকে। এমন বিপজ্জনক সময়ে তো দিনে একবারও নামায আদায় করা মানুষের জন্য কঠিন, সেখানে পাঁচবার আর তা-ও উত্তমরূপে বাজামা'ত নামায আদায় করা কতটা কঠিন হবে! কিন্তু এই বিপদের দিনগুলোতেও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই যথাসময়ে আদায় করতেন। আর যদি একদিন শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের কারণে তিনি তাঁর প্রভুর নাম নিশ্চিন্তে ও স্বাচ্ছন্দ্যে যথাসময়ে না নিতে পারেন তাহলে তিনি প্রচণ্ড কষ্ট পান।"

(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৭৩-২৭৪)

এই যুগের হাকাম ও আদাল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সমস্ত রেওয়ায়েতকে যার মাঝে এই নামাযগুলো রাতে আদায় করার উল্লেখ রয়েছে দুর্বল আখ্যা দিয়ে কেবল একটি রেওয়ায়েতকে সঠিক আখ্যা দিয়েছেন যাতে আসরের নামায নির্দিষ্ট সময়ের পরে আদায় করার উল্লেখ রয়েছে।

অতএব পরিখার যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর চার ওয়াক্তের নামায কাযা করার ওপর এক পাদরির আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বাকি রইলো এটি যে, পরিখা খননের সময় চার ওয়াক্তের নামায জমা করা হয়েছে, এই নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ প্ররোচনার উত্তর হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ধর্মে কাঠিন্য নেই। অর্থাৎ এমন কঠোরতা নেই যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হবে। তাই এটি প্রয়োজনের সময় এবং বিপদাপদের সময় নামায জমা করার এবং কসর বা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এ স্থলে আমাদের কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসে চার ওয়াক্তের নামায জমা করার উল্লেখ নেই। একথা ঠিক যে, এমনটি হতে পারে, কিন্তু কোথাও কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসের এর উল্লেখ নেই যে, চার ওয়াক্তের নামায জমা করা হয়েছে। বরং সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা-পুস্তক ফাতহুল বারী-তে লেখা আছে যে, মূল ঘটনা কেবল এটি ছিল যে, এক ওয়াক্তের নামায অর্থাৎ আসরের নামায নির্ধারিত সময়ের পর আদায় করা হয়েছে।"

তিনি বলেন যে, আপনি যদি এখন আমাদের সামনে থাকতেন তাহলে আমরা আপনাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করতাম যে, এটি আপনি কোথা থেকে নিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বিরোধীকে সম্বোধন করে একথা বলছেন যে, তুমি আমার সামনে থাকলে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম যে, তুমি এই রেওয়ায়েত কোথা থেকে নিয়েছো। তিনি (আ.) বলেন, এটি কি মুত্তাফেক আলাইহে রেওয়ায়েত যে, চার ওয়াক্তের নামায নষ্ট হয়েছিল? শরীয়তের বিধান অনুসারে চার বেলার নামায জমা করা যেতে পারে অর্থাৎ, যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা। তবে, একটি দুর্বল রেওয়ায়েতে আছে, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সহীহ্ হাদীস একে প্রত্যাখ্যান করে আর কেবলমাত্র এটিই প্রমাণিত হয় যে, আসরের নামায শেষ মুহূর্তে পড়া হয়েছিল।"

(নুরুল কুরআন নম্বর ২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড,পৃ:৩৯০)

যাহোক এটি স্পষ্ট যে, সারা দিনের নামায জমা করে (পড়া) হয়নি, বরং সংকীর্ণ সময়ে আসরের নামায পড়া হয়েছিল; (আসরের জন্য) স্বল্প সময় অবশিষ্ট ছিল। আর এ জন্যও মহানবী (সা.)-এর আক্ষেপ ছিল যে, সঠিক পদ্ধতিতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে নামায আদায় করা যায় নি।

আহযাবের যুদ্ধের বিশদ বিবরণে আরও লেখা আছে, খন্দকের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য এক স্নায়ু বিধ্বংসী যুদ্ধ ছিল। যুদ্ধভীতি ছাড়াও ক্ষুধার (কষ্ট) এবং আবহাওয়াও ছিল চরম বৈরী। কয়েক বেলা করে উপোষ থাকতে হতো। এমন সময় একটি অদৃশ্য সাহায্য এভাবে আসে যে, মুসলমানদের একটি সশস্ত্র দল তাদের কোনো এক আত্মীয়কে দাফনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে খাদ্যশষ্য বোঝাই কুড়িটি উট পায়, যেগুলো বনু কুরায়যার পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী হিসেবে মক্কার কুরাইশের কাছে যাচ্ছিল। হুয়ী বিন আখতাবের সুপারিশ এবং বিশেষ প্রচেষ্টায় এই খাদ্যসামগ্রী প্রেরণ করা হচ্ছিল। ছোট্ট একটি লড়াইয়ের পর এসব উট মুসলমানরা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করে। পরিখাবাসীরা এথেকে খায় এবং সেই উটগুলোর মধ্য হতে কয়েকটি উট জবাই করা হয় আর অবশিষ্টগুলো মুসলমানরা যুদ্ধশেষে মদীনায় নিয়ে যায়। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান এ সংবাদ জানতে পেরে বলে, হুয়ী কতই না অশুভ সাব্যস্ত হলো! এখন আমাদের ফেরত যাওয়ার সময় নিজেদের মালপত্র বহনের জন্য আমাদের কাছে কোনো বাহনও নেই।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮২)

যেভাবে তারা ঘিরে রেখেছিল (এমন) যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এটি বৈধ ছিল। যদি তারা (অর্থাৎ মুসলমানরা)তাদের খাদ্যসামগ্রী দখল করে থাকে তাহলে এটি একেবারে বৈধ ছিল।

মহানবী (সা.)-এর আহযাব (তথা সম্মিলিত বাহিনীর) বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করার উল্লেখও এভাবে পাওয়া যায়। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) সোম, মঙ্গল ও বুধবার যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আসেন; অতঃপর নিজের গায়ে চাদর জড়ান এবং দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে আহযাবের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করেন। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর চেহারায় খুশির (ঝিলিক) দেখেছি। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন অওফা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আহযাবের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করেন। আবু নুআয়েম (রা.) যুক্ত করেছেন, এতে (তিনি) অতিরিক্ত একথা বলেছেন যে, তিনি (সা.) সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন; এরপর তিনি লোকদের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, "হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর সাথে লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষা কোরো না বরং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা কামনা করো। যদি শত্রুর সাথে তোমাদের সংঘাত বেঁধে যায় তাহলে ধৈর্য ধারণ করো এবং জেনে রাখো! জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচে।"

অতঃপর বলেন,

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! ঐশীগ্র ন্থ অবতীর্ণকারী! দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! তুমি সৈন্যদলকে পরাস্ত করো। হে আল্লাহ্! তাদেরকে পরাভূত করো এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

এক রেওয়ায়েতে এই দোয়াও বর্ণিত হয়েছে, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ. اَللّٰهُمَّ اِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমার প্র তিশ্র ুতি ও অঙ্গীকারের দোহাই দিচ্ছি। হে আল্লাহ্! তুমি যদি চাও তাহলে তোমার এই ইবাদত করা হবে না'।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত

হয়ে গেছে, অবস্থা খুবই শোচনীয়। আমাদের পাঠ করার জন্য কোনো দোয়া আছে কি? অথবা এমন কোনো দোয়া

শেখান যা আমরা করতে পারি। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তোমরা বলো, اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমাদের দোষ - ত্রুটি ঢেকে দাও এবং আমাদের ভয়ভীতি দূর করে দাও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও বর্ণনা করেছেন, "কতিপয় মুসলমান বিচলিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! পরিস্থিতি খুবই আশঙ্কাজনক। বাহ্যত এখন মদীনার রক্ষা পাওয়ার আর কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না। আপনি এখন বিশেষভাবে আল্লাহর তা'লার কাছে দোয়া করুন আর আমাদেরকেও এমন কোনো দোয়া শিখিয়ে দিন যা পাঠ করলে আমাদের প্র তি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বর্ষিত হবে।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

তিনি (সা.) বলেন, তোমরা বিচলিত হয়ো না। তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করো, তিনি যেন তোমাদের সকল দুর্বলতা ঢেকে রাখেন এবং তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করেন আর তোমাদের উদ্বেগ দূর করে দেন। এরপর তিনি(সা.) নিজেও এভাবে দোয়া করেন,

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

আর একইভাবে এই দোয়া করেন,

يَا صَرِيْخَ الْمَكْرُوْبِيْنَ يَا مُجِيْبَ الْمُضْطَرِّيْنَ
اكْشِفْ هَمِّيْ وَغَمِّيْ وَكَرْبِيْ
فَاِنَّكَ تَرٰى مَا نَزَلَ بِيْ وَبِاَصْحَابِيْ۔

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! যিনি আমার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যিনি তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করতে পারেন। এই দলটি, যারা সম্মিলিতভাবে এসেছে তাদেরকে পরাজিত করো। হে আল্লাহ্! আমি পুনরায় নিবেদন করছি, তুমি তাদেরকে পরাস্ত করো আর আমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করো আর তাদের ষড়যন্ত্রকে নড়বড়ে করে দাও'।

(উক্ত দোয়ার অনুবাদ হলো,) 'হে বেদনাক্লিষ্টদের দোয়া শ্রবণকারী! হে উদ্বেগাকুল লোকদের প্রার্থনার উত্তর প্রদানকারী! আমার কষ্ট, আমার দুশ্চিন্তা এবং আমার উদ্বেগ দূর করে দাও, কেননা আমি এবং আমার সাথীরা যে বিপদাপদের সম্মুখীন সে সম্পর্কে তুমি অবগত'।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৭৫)

ইতিহাসে লেখা আছে, এভাবে যুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল আর মক্কার কুরাইশ এবং তাদের মিত্র গোত্রগুলো তখন এই দীর্ঘ অবরোধের কারণে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। আর যত দ্রুত সম্ভব কোনো চূড়ান্ত আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে উদ্গ্রীব ছিল। কেননা, রণকৌশলগত দিক দিয়ে যেভাবে মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ ছিল আর বনু কুরায়যার মতো তাদের মিত্র মদীনার ভেতরে অবস্থান করছিল; এসব বিষয় কাফিরদের প্রত্যাশা ও সাহস বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ঠ ছিল। তখন তারা আমরা সবাই মিলে একবারে সম্মিলিত আক্রমণ করে মদীনার প্রত্যেকটি ইট খুলে নিতে চাচ্ছিল। (একদিকে) কাফিরদের নেতা এই কর্মপরিকল্পনা করছিল যে, 'তদবীরে কুনদ বান্দা' অর্থাৎ বান্দা পরিকল্পনা করে। আর অন্য দিকে আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা কি ছিল? 'তকদীরে কুনদ খান্দা'অর্থাৎ খোদার নিয়তি (তাদের পরিকল্পনায়) হাসছিল যে, এবার দেখো আমি তোমাদের সাথে কি করতে যাচ্ছি! অর্থাৎ,তাঁর (আল্লাহ্র) কোনো পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় না। এরপর তকদীর কুনদ খানদাহ- অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা এক অদৃশ্য সাহাযের সূচনা করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন, 'নুয়ায়েম বিন মাসঊদ নামে বনু গাতফান গোত্রের শাখা আশজাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তিনি মদীনায় পৌঁছে। এই ব্যক্তি মনে মনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও কাফিররা তার মুসলমান হবার সংবাদ জানতো না। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এমন কৌশল অবলম্বন করেন যার ফলে কাফিরদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। সর্বপ্রথম নুয়ায়েম বিন মাসঊদ বনু কু রায়যা গোত্রের কাছে যায়, আর তাদের সাথে যেহেতু তার পুরোনো সম্পর্ক ছিল। তাই সে তাদের গোত্র প্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, আমার মনে হয় তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে চুক্তিভঙ্গ করে কুরাইশ ও গাতফানদের সাথে যোগ দিয়ে কাজটি ভালো করো নি। কুরাইশ ও গাতফান তো এখানে মদীনায় কয়েকদিনের অতিথিমাত্র কিন্তু তোমাদের তো এখানেই থাকতে হবে। কেননা এটিই তোমাদের দেশ, আর এখানে মুসলমানদের সাথেই তোমাদের ওঠাবসা হবে আর তোমরা একথা স্মরণ রেখো, কুরাইশ প্রভৃতিরা এখান থেকে যাবার সময় তোমাদের কোনো রক্ষণাবেক্ষণ করবে না এবং তোমাদেরকে এভাবে মুসলমানদের করুণার পাত্র করে রেখে যাবে। অতএব তোমরা কুরাইশ ও গাতফান গোত্রকে কমপক্ষে এটি বলো, তারা যেন নিজেদের কিছু মানুষ জিম্মিরূপে তোমাদের অধীনস্থ করে যার ফলে তোমরা আশ্বস্ত হবে যে, তোমাদের সাথে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না। বনু কুরাইযার সর্দাররা নুয়াইমের এ কথা বুঝতে পারল এবং তারা কুরাইশের নিকট জিম্মি চাইতে সম্মত হলো, যেন পরবতীতে তাদের কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে না হয়। অতঃপর নুয়াইম বিন মাসুদ কুরাইশের সর্দারদের কাছে যায় এবং গিয়ে বলে, বনু কুরায়যা ভীতসন্ত্রস্ত- পাছে তোমরা চলে যাবার পর তাদের ওপর বিপদ এসে পড়ে! এ কারণে তারা তোমাদের সংকল্পে দোদুল্যমান হয়ে পড়ছে এবং এই বাসনা করছে যে, জামানতরূপে তোমাদের নিকট কিছু মানুষ জিম্মি চাইবে, কিন্তু তোমরা তাদেরকে কখনো জিম্মি প্রদান করবে না; (কেননা) তারা না আবার তোমাদের সাথে প্রতারণা করে তোমাদের জামানত রাখা ব্যক্তিদেরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়, ইত্যাদি। একইভাবে সে গাতফান গোত্রের কাছে গিয়ে অনুরূপ কথা বলে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যোগসূত্র এমনভাবে মিলল যে, কুরাইশ এবং গাতফান গোত্র প্রথম থেকেই এ প্রস্তাবনা দিয়ে আসছিল যে, মুসলমানদের ওপর পুনরায় সম্মিলিত আক্রমণ করা হোক আর এই আক্রমণ শহরের চারিদিক থেকে একসাথে করা হোক, যেন মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যাল্পতার কারণে এটি প্রতিহত করতে না পারে এবং কোনো না কোনো স্থান থেকে সারি ভেঙে যায় আর সারি ভেঙে আক্রমণকারীদের পথ করে দেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা বনু কুরায়যাকে বলে পাঠায় যে, অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছে এবং লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। অতএব আমরা এ প্রস্তাব দিয়েছি যে, সকল গোত্র মিলে আগামীকাল মুসলমানদের ওপর একটি সম্মিলিত আক্রমণ করা হোক, ফলে তোমরাও কালকের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। বনু কুরায়যা, যাদের সাথে পূর্বে ই নুয়াইম বিন মাসুদের কথা হয়েছিল- এ উত্তর দিল, আগামীকাল তো আমাদের সাবাতের দিন, তাই আমরা অপারগ। আর এমনিতেও আমরা এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে পারব না, যতক্ষণ পর্য ন্ত আপনারা এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, আপনাদের পক্ষ থেকে পরবর্ত ীতে আমাদের সাথে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না- কিছু মানুষ আমাদের অধীনস্থ না করছেন। বনু কুরায়যার এই উত্তর কুরাইশ ও গাতফান গোত্রকে শোনানো হলে তারা হতবাক হয়ে গেল এবং বলল, নুয়াইম সত্য বলেছে- বনু কুরায়যা আমাদের সাথে প্রতারণা করতে মুখিয়ে আছে। পক্ষান্ত রে বনু কুরায়যা যখন কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের প্রত্যুত্তর শুনল যে, আমরা জিম্মি পাঠাবো না; তোমরা সাহায্য করতে আসতে চাইলে এভাবেই আসো, তখন বনু কুরায়যা বলল, নুয়াইম আমাদেরকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছিল যে, কুরাইশ ও গাতফানের নিয়তে গরমিল আছে। আর এভাবে নুয়াইমের সুন্দর পরিকল্পনার কারণে কাফিরদের শিবিরে ফাটল ও মতভেদ সৃষ্টি হলো। উভয়ে একে অপরের সন্দেভাজন হয়ে গেল।এই হলো নুয়াইমের পরিকল্পনা গ্রহণের আদ্যোপান্ত- কিন্তু নুয়াইমের চরম স্বার্থকতা হলো, সে এহেন স্পর্শকাতর পরিস্থি তির মাঝেও যথাসম্ভব এমন কোনো কথা নিজের মুখে উচ্চারণ করে নি যাকে স্পষ্টভাবে মিথ্যা বর্ণনারূপে আখ্যা দেওয়া যায়। এছাড়া যুদ্ধকৌশল হিসেবে কেউ যদি কোনো কৌশল অবলম্বন করে, কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করে কিংবা কোনো চাল চালে যার ফলে মানুষ শত্রুর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত হতে পারে- তাহলে এটি কোনো আপত্তিকর বিষয় নয়, বরং যুদ্ধকৌশলের একটি অত্যন্ত উপকারী অংশ, যার মাধ্যমে অত্যাচারী শত্রুকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করতে এবং অপ্রয়োজনীয় রক্তপাতের ধারা বন্ধ করতে অনেক সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৯১-৫৯৩)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "কিছুদিন পর উভয় গোত্র এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, একটি নির্ধারিত সময়ে ইহুদী ও মুশরিকদের সৈন্যবাহিনী অকস্মাৎ মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করবে কিন্তু সেসময় এক অদ্ভুতরূপে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্র কাশিত হয় যার বিবরণ হলো, নুয়াইম নামক এক ব্যক্তি যাকে গাতফান গোত্র মুসলমান মনে করত। এ ব্যক্তিও কাফিরদের সাথে এসেছিল কিন্তু এ অপেক্ষায় ছিল যে, আমি সুযোগ পেলে মুসলমানদের সাহায্য করব। একা মানুষ কিবা করতে পারত, কিন্তু যখন সে দেখল, ইহুদীরাও কাফিরদের সাথে মিলে গিয়েছে এবং বাহ্যত এখন আর মু সলমানদের সুরক্ষার কোনো পথ দেখা যাচ্ছিল না, তখন এ অবস্থার ফলে সে এতটা প্রভাবিত হলো যে, সে সিদ্ধান্ত নিল, এই নৈরাজ্য দূর করতে আমার কিছু না কিছু করা উচিত। অতএব দুই গোত্র মিলে যখন একদিন আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত হলো তখন সে বনু কুরায়যার কাছে গেল এবং তাদের সর্দারদের বলল, আরবদের সৈন্যবাহিনী যদি পলায়ন করে তবে মুসলমানরা তোমাদের কী দশা করবে- বলো? তোমরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ আর চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করার পরিণতিতে যে শাস্তি তোমরা পাবে তা একবার কল্পনা করো। তারা কিছুটা ভয় পেল এবং জিজ্ঞস করল, তাহলে আমরা কী করব? নুয়াইম বলল, আরবরা যখন স ম্মিলিত আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তোমরা মুশরিকদের কাছে দাবি করবে যে, তোমরা তোমাদের সত্তর জন ব্যক্তিকে আমাদের কাছে জামানতরূপে প্রে রণ করো। তারা আমাদের দুর্গের সুরক্ষা করবে এবং আমরা মদীনার পশ্চাৎ দিক থেকে এর ওপর অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করব। অতঃপর সে সেখান থেকে ফিরে এসে মুশরিকদের সর্দারদের কাছে গেল এবং তাদেরকে বলল, এ ইহুদীরা তো মদীনার অধিবাসী। চরম মুহূর্তে যদি তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তোমরা কী করবে? এরা যদি মুসলমানদের খুশি করার জন্য এবং নিজেদের অপরাধ ক্ষমা করানোর জন্য তোমাদের নিকট তোমাদের কিছু মানু ষকে জামানতরূপে চায় আর তাদেরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়, সেক্ষেত্রে তোমরা কী করবে? তোমাদের উচিত তাদের পরীক্ষা করা যেন (বুঝতে পারো) তারা দৃঢ়পদ আছে নাকি নেই আর দ্রুত তাদেরকে তোমাদের সাথে মিলে আক্রমণ করার আহ্বান জানাও। কাফির সর্দাররা এই পরামর্শকে সঠিক মনে করে

পরবর্তী দিন ইহুদীদেরকে বার্তা পাঠায়, আমরা সম্মিলিতভাবে একটি আক্রমণ করতে চাই, তোমরাও আগামীকাল সৈন্যসামন্ত-সহ আক্রমণ করো। বনু কুরায়যা বলল, প্রথমত- আগামীকাল আমাদের সাবাতের দিন আর সাবাতের দিন আমরা আক্রমণ করি না, তাই আমরা ওই দিন আক্রমণ করতে পারব না। দ্বিতীয়ত আমরা মদীনার অধিবাসী আর তোমরা বহিরাগত। তোমরা যদি রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে যাও তাহলে আমাদের কী হবে? তাই তোমরা আমাদেরকে সত্তর জন ব্যক্তিকে জামানতরূপে প্রদান করো, তখনই আমরা যুদ্ধে অংশ নেব। কাফিরদের হৃদয়ে যেহেতু পূর্ব থেকেই সন্দেহ দানা বেঁধেছিল, তাই তারা এই দাবি পূর্ণ করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং বলল, আমাদের সাথে তোমাদের জোট বাঁধা যদি সত্যি হয় তবে এ ধরনের দাবি উত্থাপনের কোনো অর্থ হয় না। এ ঘটনার ফলে একদিকে ইহুদীদের হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হতে থাকে, অন্যদিকে কাফিরদের হৃদয়েও সন্দেহ দানা বাঁধে। আর যেমনটি চিরাচরিত রীতি- সন্দেহ একবার হৃদয়ে দানা বাঁধলে বীরত্বের স্পৃহা হারিয়ে যায়।"

(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ:২৮০-২৮১)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি এক রাতে প্র বল ধূলিঝড়ের আকারে প্রকাশিত হয় যার ফলে আহযাব তথা মুশরিকদের আক্রমণকারী বিভিন্ন গোত্র পলায়ন করতে বাধ্য হলো। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, ইবনে ইসহাক এটিকে এভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রচণ্ড শীতের রাতে এমন তুফান সৃষ্টি করেন যা কাফিরদের হাড়িপাতিল ওলটপালট করে দেয় এবং বাসনপত্র উড়ে যায়। বালাযারী লিখেছেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা প্রবল ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমে কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করেন। এটি হলুদাভ বর্ণের ধূলিঝড় ছিল যা তাদেরচোখে ঢুকে গিয়েছিল। তাদের মাঝে দুর্বলতা এবং কাপুরুষতা প্রবেশ করিয়ে দেয়। আর মুশরিকরা পিছু হটা আরম্ভ করে এবং নিজেদের ঘাঁটিতে চলে যায়। প্রবল ঝড় তাদের ওপর বইতে থাকে আর তাদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) ফেরেশতা বাহিনী ঘিরে রাখে। তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয় আর তারা পলায়ন করে।"

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩৮৬-৩৮৭)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণনা করেছেন, "হয়ত নুয়াইম বিন মাসুদের এই শান্তিপ্রিয় প্রচেষ্টা বিফলে যেতে পারত এবং সাময়িক পরাজয় ও পতনের পর কাফিরদের মাঝে পুনরায় ঐক্য এবং স্থিতিশীলতার চেতনা জেগে উঠতে পারত, কিন্তু ঐশী অভিপ্রায়ে এমন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটলো যে, সেই ঘটনার পর রাতের বেলা প্রচণ্ড এক ঝড়োহাওয়া শুরু হলো যা কাফেরদের বিশাল সেনা ছাউনি যেটি এক খোলা ময়দানে অবস্থিত ছিল, এক ভয়ানক ধুড়িঝড় সৃষ্টি করে দিলো। তাবু উপড়ে গেল। তাবুগুলোর পর্দা ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল। হাড়িগুলো উল্টে গিয়ে চুলাসমূহে পতিত হলো আর বালু এবং নুড়ি পাথরের বৃষ্টি মানুষের কান, চোখ এবং নাকে ঢুকে ভরে যেতে থাকলো আর সবচেয়ে বড় যে ধ্বংসযজ্ঞ হলো (তা হলো) সেই জাতীয় আগুন যা আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী রাতের বেলা অতি ভক্তিসহকারে প্রজ্জ্বলিত করে রাখা হতো, সেগুলো এদিক সেদিক খড়কুটোর ন্যায় উড়ে গিয়ে নিভে যেতে লাগলো। [তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, সেই আগুন কোনোভাবে নির্বাপিত হবে না।]সেই দৃশ্য কাফেরদের ভ্রমগ্রস্ত হৃদয়গুলোকে যা পূর্বেই অবরোধের বেদনাদায়ক দৈর্ঘ্য আর জোটের পারস্পরিক অবিশ্বাসের তিক্ত অভিজ্ঞতায় নড়বড়ে হচ্ছিল, তাতে এমন এক ধাক্কা লাগে যা তারা সামলে উঠতে পারে নি আর প্রভাত উদয়ের পূর্বেই মদীনার দিগন্ত কাফের সেনাদলের ধুলোবালি থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল। অতএব ঘটনা যা হয় তা হলো, এই ধুলিঝড়ের তীব্রতা যখন বৃদ্ধি পায় তখন আবু সুফিয়ান নিজের আশপাশের কুরায়েশ নেতাদেরকে ডেকে বলে, আমাদের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এখন এখানে আর অধিককাল অবস্থান করা সমীচীন হবে না। তাই উত্তম হলো, চলো আমরা ফিরে যাই আর আমি তো যাচ্ছিই। একথা বলে সে নিজ লোকদেরকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেয় আর নিজের উটে আরোহন করে কিন্তু তার ভীতিকর যে অবস্থা ছিল ছিল তা হলো, সেউটের পায়ের রশি খোলার কথাও ভুলে গেল আর আরোহন করার পর উট অগ্রসর না হওয়াতে মনে পড়লো যে, উটের পায়ের রশি এখনো খোলা হয় নি। সে সময় একরামা বিন আবু জাহল আবু সুফিয়ানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কিছুটা রুক্ষ স্বরে বলল, হে আবু সুফিয়ান! তুমি তো সেনাপতি, তুমি তো সেনা প্রধান অথচ সেনাবাহিনী রেখে পালিয়ে যাচ্ছ! অন্যদের ব্যাপারে তোমার কোন চিন্তা নেই! ফলস্রুতিতে আবু সুফিয়ান লজ্জিত হয় আর উট থেকে নেমে বলে, ঠিক আছে, এখনই যাচ্ছি না কিন্তু তোমরা দ্রুত প্রস্তুতি নাও আর যতটা দ্রুত সম্ভব এখান থেকে প্রস্থান করো। অতএব লোকেরা দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো আর আবু সুফিয়ান কিছুক্ষণ পর নিজের উটে আরোহন করে ফিরতি যাত্রা শুরু করল। তখনও বনু গাতফান এবং অন্যান্য গোত্রগুলো কুরায়েশের এই পলায়ন সম্পর্কে অনবহিত ছিল কিন্তু কুরায়েশের শিবির দ্রুততার সাথে যখন খালি হওয়া শুরু হলো তখন অন্যান্যরাও এ খবর পেয়ে গেল ফলে তারাও ভীত হয়ে যাত্রার ঘোষণা দিল আর বনু কুরায়যাও নিজেদের দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে গেল এবং আর বনু কুরায়যার সাথে বনু নাযীরের নেতা হুয়ী বিন আখতাবও তাদের দুর্গে চলে আসলো, এ সময় প্রভাতের শুভ্রতা প্রকাশ পাওয়ার আগেই সমস্ত ময়দান খালি হয়ে গেল আর ঘটনার আকস্মিক এবং বিস্ময়কর রূপান্তরের মাধ্যমে মুসলমানরা বিজিত হতে হতে বিজয়ী হয়ে গেল।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৯৩-৫৯৪)

কোথায় এই অবস্থা ছিল অর্থাৎ শঙ্কা ছিল পাছে কাফের (মদীনা) দখল করে নেয় কিন্তু এখন অবস্থা হলো, মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে গেল।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)ও এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন: "সংশয় ও সন্দেহ সঙ্গী করে কাফের সেনাদল রাতের বেলা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য নিজেদের শিবিরে চলে গেল। তখন খোদা তা'লা ঐশী সাহায্যের অপর একটি পথ উন্মোচন করে দিলেন। রাতে তীব্র ধুলিঝড় হয় যেটি তাবুগুলোর পর্দা ছিড়ে ফেলে। চুলার ওপর থেকে পাতিল ফেলে দেয় আর কতিপয় গোত্রের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নিভে যায়। মুশরেক আরবদের মাঝে একটি রীতি ছিল যে, তারা সারা রাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতো এবং এটিকে তারা শুভ লক্ষণ মনে করতো। যার আগুন নিভে যেত সে মনে করতো যে, আজকের দিন আমার জন্য অশুভ আর তখন সে নিজের তাবু তুলে রণক্ষেত্র থেকে পিছু হটতো আর যে গোত্রের আগুন নিভে যেত তারা এই রীতি অনুসারে নিজেদের তাবু উঠিয়ে পিছু হটতো যেন এক দিন পশ্চাতে অপেক্ষা করে পুনরায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে পারে কিন্তু যেহেতু দিনের বেলা বাক-বিতণ্ডার কারণে দলের নেতাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছিলো। যেসব গোত্রগুলো পশ্চাৎপদ হয়েছিল তাদের আশ-পাশের গোত্রগুলো মনে করে যে, হয়তো ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে মিলে রাতের বেলা অতর্কিত হামলা করেছে এবং আমাদের আশপাশের গোত্রগুলো পলায়ন করছে। অতএব তারাও দ্রুত নিজেদের তাবু গুটানো আরম্ভ করে এবং রণক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করে। আবু সুফিয়ান নিজের তাবুতে সুখ-নিদ্রায় ছিলো সে এই ঘটনা যখন জানতে পারে । তখন ভয়ে নিজের বেঁধে রাখা উটের পিঠে আরোহন করে এবং সেটিকে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করা শুরু করে। অবশেষে তার বন্ধুরা তার মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, কী বোকামি করছো? অতপর সে উটের বাঁধন খুলে এবং নিজের সঙ্গীসাথীসহ রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৮১)

কাফেরদের যখন এই অবস্থা হয় তখন মহানবী (সা.) তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য হুযায়ফা বিন ইয়ামান(রা.)-কে মুশরেকদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রে রণ করেন। এর বিস্তারিত বিবরণে সীরাত খাতামাননাবীঈন পুস্তকে লেখা আছে যে, সেই রাতেই যখন কাফেররা এভাবে নিজ থেকেই রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন মহানবী (সা.) নিজের আশপাশের সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন যে, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কি আছে যে এখন গিয়ে শত্রুদের অবস্থা জেনে আসতে পারবে? কিন্তু সাহাবীরা বর্ণনা করেন যে, সেই সময় এত তীব্র ঠাণ্ডা ছিল, এছাড়া ভয়, ক্লান্তি ও ক্ষুধার এমন অবস্থা ছিলো যে, আমাদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তিই নিজের মধ্যে এই শক্তি পাচ্ছিলো না যে, উত্তরে কিছু বলবে বা নিজের অবস্থান থেকে নড়াচড়া করবে। অবশেষে মহানবী (সা.) নিজেই নাম ধরে হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.)-কে ডাকলেন। যার ফলে তিনি ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে উঠেন আর মহানবী (সা.)-এর সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি (সা.) পরম মমতার সাথে তার মাথায় নিজ হাত বুলিয়ে দেন আর তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন এবং বলেন, "তুমি একেবারেই ভয় পেয়ো না, নিশ্চিন্ত থাকো, ইনশাল্লাহ্ তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি কেবল চুপিসারে কাফেরদের ঘাঁটিতে যাও এবং কারো সাথে বিতণ্ডা করবে না আর নিজ পরিচয় প্রকাশ করবে না।

হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি যখন যাত্রা করি তখন আমি দেখি যে, আমার শরীরে ঠান্ডার কোন নাম-চিহ্ন নেই। কোথায় এই অবস্থা ছিলো যে, ঠান্ডায় আমি কাঁপছিলাম, তিনি বলেন, ঠান্ডার কোন নাম-চিহ্নও ছিলো না বরং আমার এমন মনে হচ্ছিল যে, একটি উষ্ণ রুমের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এবং আমার ভয় দূর হতে লাগলো। সে সময় নিরেট ঘুটঘুটে রাতের অন্ধকার ছিল। আমি একান্ত নির্ভয়ে কিন্তু চুপিসারে কাফেরদের ঘাঁটিতে পৌঁছে যাই। তখন আমি দেখি, আবু সুফিয়ান এক স্থানে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছে। আমি তাকে দেখেই তৎক্ষনাত নিজের তির ধনুকে লাগাই এবং প্রায় তির নিক্ষেপ করব, ঠিক তখনই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা স্মরণ হয় আর আমি তির নিক্ষেপ করা থেকে বিরত হই। যদি সেই সময় আমি তির নিক্ষেপ করতাম তাহলে আবু সুফিয়ান এতটাই নিকটে ছিলো যে, নিশ্চিত সে মারা যেত। সে সময় আবু সুফিয়ান নিজ সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিলো। অতপর সে আমার সামনেই উটের ওপর আরোহন করে কিন্তু ভয়ের কারণে সে তার উটের পায়ের রশি খুলতে ভুলে যায়। এরপর আমি ফেরত চলে আসি। তিনি (রা.) বলেন, আমি যখন নিজেদের শিবিরে পৌঁছাই তখন মহানবী (সা.) নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁর নামায

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 31 Oct-7 Nov 2024 Issue No.44-45

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(২ পাতার পর.....)

Architecture, Health and Care, Educational Scienceপ্রভৃতি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে। ১৪০ জন ওয়াকফাত বিবাহিতা। ২৩জন ওয়াকফাত বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। ৪০জন ওয়াকফাত অনুবাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত। এখন পর্যন্ত ২২জন ওয়াকফাত শিক্ষিকার পরীক্ষা পাস করেছে। আরও ৪০০ জন ওয়াকফাত শিক্ষিকার কোর্স করছে।

অনুরূপভাবে ১৪০জন ওয়াকফাত উর্দু প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে তাদেরকে উর্দু পড়া এবং কমপোজিং শেখানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জার্মানীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়াকফাতের ১০ জনের দল সালানা ইজতেমায় রক্ষী হিসেবে ডিউটি দিয়েছে। অনুরূপভাবে আরও অনেক ওয়াকফাত খিদমতের ময়দানে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশাবলী

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা খুব সুন্দর অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু এটা মনে রাখাও অনেক কঠিন। সমবেত কণ্ঠে নযম মুখস্ত করেছ, এখন বাড়ি গিয়ে সেটা মনে রাখবে, ভুলে যেও না।

তিলাওয়াতে কুরআন করীমের সূরা তওবার ৭১ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে। এই আয়াতে তবলীগের বিষয়ে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সৎ কাজের উপদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সৎ কাজের উপদেশ তারাই দিতে পারে যারা নিজেরাও সৎ কাজ করে। অনুরূপভাবে অসৎ কাজ থেকে তারাই মানুষকে বিরত রাখতে পারে যারা নিজেরাও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। প্রত্যেক ওয়াকফা নও-এর একথা স্মরণ রাখা উচিত। প্রথমত, একজন আহমদী বালিকা ও মহিলার কর্তব্য (প্রত্যেক আহমদীরই এটা কর্তব্য) আহমদীরা অন্যদের থেকে পৃথক। অধিকন্তু একজন ওয়াকফা নও এবং সাধারণ মেয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। আপনারা নিজেদেরকে ওয়াকফ করেছেন কিম্বা শৈশবে বা আপনাদের জন্মের পূর্বে আপনাদের মাতাপিতা আপনাদেরকে ওয়াকফ করেছেন এবং পনেরো বছরের পর নিজেদের অঙ্গীকারের নবায়নের মাধ্যমে নিজেদেরকে নতুন করে ওয়াক করেছেন। সব সময় মনে রাখবেন যে,

যৌবনে পদার্পণ করার পর আপনাদের সেই সব বিষয় সন্ধান করা উচিত যেগুলি আল্লাহ্ তা'লার নিকট পছন্দনীয়। পুণ্যকর্ম কোনগুলি? আল্লাহ্ তা'লা বলেন- পুণ্যকর্ম সেগুলিই যা তিনি কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন। মন্দকর্ম কোনগুলি? যেগুলি তিনি কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন। অতএব, পুণ্যকর্ম অবলম্বন করা এবং পাপ বর্জন করা বিশেষ করে ওয়াকফে নওদের কাজ। কোনটা পাপ আর কোনটা পুণ্য তা জানার জন্য আপনাদের কুরআন পাঠ করা আবশ্যক। কুরআন করীমের তিলাওয়াতই যথেষ্ট নয়, বরং অনুবাদও পড়া উচিত। যেগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া আছে সেগুলি পড়ুন যাতে বুঝতে পারেন যে, আপনাদের কাজ কি এবং আপনাদের কর্তব্য কি? সাধারণ মেয়েদের মত কেবল ফ্যাশন করাই আপনাদের কাজ নয়। কিম্বা লাজনাদের কাজের জন্য সপ্তাহান্তে এক ঘন্টা অফিসে কাজ করে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং ওয়াকফে নওদের পুরো দায়িত্ব হল সব সময় এ বিষয়ের প্রতি যত্নবান থাকা যে, তাদেরকে মানুষের দৃষ্টিতে আদর্শ হয়ে উঠতে হবে। তাদের ডিউটি ২৪ ঘন্টা। নিজের বাড়িতে, ভাই-বোনদের সামনে, বাইরে পথে ঘাটে এবং অন্যান্য আহমদীদের জন্যও তাদেরকে আদর্শ হয়ে উঠতে হবে। একথা আমি পূর্বেও বহুবার বলেছি, আমি পুনরায় বলছি, কথাগুলো মনে রাখবেন, তবেই আপনারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারবেন।

আপনারা এখানে হাদীসও উপস্থাপন করেছেন। এবং সমবেত কণ্ঠে নযমও পরিবেশন করেছেন যার মর্মার্থ হল আনুগত্য প্রদর্শন করা। হাদীসে বলা হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- সর্বাবস্থায় আনুগত্য করতে হবে। প্রশ্নহীন আনুগত্য। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেকের অভিযোগ থাকে সদর বা সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে। তারা অভিযোগ করে যে অমুক মেয়েকে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। (ক্রমশ..)

২য় খুতবার শেষাংশ....

শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। এরপর তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলি। ফলে তিনি (সা.) খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, "এটি আমাদের কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা বাহুবলের পরিণাম নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ফলেই (এই বিজয়) লাভ হয়েছে যিনি নিজ ফুৎকারে এই শত্রুদলকে পরাস্ত করেছেন। এরপর কাফেরদের পলায়নের খবর দ্রুতই সমস্ত মুসলমানদের মাঝে চাউর হয়ে যায়।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৯৪-৫৯৫)

এই ঘটনাটিকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)ও এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাতের শেষভাগে সেই যুদ্ধক্ষেত্র যেটিতে প্রায় পঁচিশ হাজার কাফের সৈন্য তাঁবু গেড়েছিল, সেটি একটি জঙ্গালের ন্যায় জনশূন্য হয়ে গেল। সে সময় আল্লাহ্ তা'লা ইলহাম করে রসূলুল্লাহ (সা.) কে জানালেন, তোমার শত্রুদের আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন তবেই তিনি (সা.) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, কে আছে যে আসবে? তিনি (সা.) প্র কৃত অবস্থা জানার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে চাচ্ছিলেন এবং নিজের আশেপাশের সাহাবীদের ডাক দিলেন। সেটা শীতের সময় ছিল এবং মুসলমানদের কাছে পর্যাপ্ত কাপড়ও থাকতো না। শীতের তীব্রতায় জিহ্বাও জমে যাচ্ছিল। কথা বলতে পারছিলেন না। কয়েকজন সাহাবী বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.) এর আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং আমরা উত্তরও দিতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাদের পক্ষে কথা বলা সম্ভব হয় নি। শুধু এক হুযায়ফা (রা.) ছিলেন যিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কী কাজ? এখানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এটা বলেন নি যে, তিনি (সা.) হুযায়ফাকে (রা.) ডাক দিয়েছিলেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হুযায়ফা (রা.) বলাতে তিনি (সা.) বললেন, তুমি না, আমার অন্য ব্যক্তি দরকার। তিনি (সা.) পুনরায় বললেন, কেউ আছে? কিন্তু আবারো শীতের তীব্রতার কারণে যারা জেগে ছিলেন তারাও উত্তর দিতে পারেন নি। হুযায়ফা (রা.) পুনরায় বললেন, আমি উপস্থিত আছি আল্লাহ্র রসূল! পরিশেষে তিনি (সা.) হুযায়ফাকে এই কথা বলে পাঠালেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আমি তোমার শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছি। শত্রুদের কী অবস্থা দেখে আস। হুযায়ফা (রা.) পরিখার নিকটে গেলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র শত্রু সৈন্য থেকে সম্পূর্ণ শূন্য দেখতে পেলেন। তিনি ফেরত আসলেন এবং কলেমা শাহাদাত পাঠ করে রসূলুল্লাহ (সা.) এর রিসালাতের সত্যায়ন করলেন এবং বললেন, শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেছে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৮১-২৮২)

অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে বর্ণনা করবো।

যেভাবে আপনারা জানেন পৃথিবীর অবস্থা প্র তিনিয়ত অবনতির দিকে যাচ্ছে, ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। আমেরিকা এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। যুদ্ধ বিস্তৃত হয়ে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের এবং নিরপরাধদের এর ভয়ানক কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করুন। এর জন্য আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কে অগ্রসর হতে হবে এবং দোয়ার দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। এর দিকে প্রত্যেক আহমদীকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

পাকিস্তানের আহমদীদের অবস্থার অনেক বেশি অবনতি হচ্ছে, তাদের জন্য দোয়া করুন। বাংলাদেশের আহমদীদের অবস্থার উন্নতির জন্যও দোয়া করুন। তাদের ওপরও অনেক কঠোরতা করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি দয়া ও কৃপা করুন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৫ শে অক্টোবর, ২০২৪)

****

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir